প্রকাশকাল : জানুয়ারী, ১৯৬০

প্রকাশক

নমিতা চৌধুরী

৪/৮ শহীদ নগর

কলিকাতা-৭০০ ০৩১

মুদ্রক

বিশ্বাস প্রিন্টিং হাউস

১৩০ কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০ ০০৯

গ্রন্থক

গৌরাঙ্গ বাইণ্ডার্স

৭৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০ ০০৯

পরিবেশক

অনুষ্টুপ, কথাশিল্প, বুকমার্ক, নিউ বুক সেণ্টার,

পিপলস্ বুক সোসাইটি, পিস পাবলিশিং হাউজ

সূচীপত্র

ভ্রম সংশোধন

পৃষ্ঠা	যা হয়েছে	যা হবে
২৯	আলেকজার	আলেকজাণ্ডার
২৯	নিদ্ধিধায়	নির্দ্বিধায়
৩০	পারেনি	পারেন
৫৭	কানে	কনে
৬৮	থাঝবে	থাকবে
৭৩	রঙেব	রঙের
৭৩	ময়ুর	ময়ূর

কামধেনু বন্যা

কামধেনু বন্যা রে তুই
কার কামনায় মন মজালি ?
কোন সোহাগীর পুত সে রে তুই
আমায় ভাসালি ।
আমার হাতে লাঙ্গল সুত
কি অদ্ভুত,
মাটির ছোঁয়া পেলেই আমি বুঝতে পারি মাটি মায়ের কান্না
তাই কি আমি জলবন্দী, এমারজেন্সী বন্যা ।
নাকি দুয়োরানীর ছেলে আমি
ঘুটে কুড়ুনী আমার মা !
রাজার হুকুম, কেউ দেবেনা হরিবোল—
একাই হেঁটে শ্মশান যা ।

মুখ আমার হাতে

শৈশবে মাকে হারিয়েছি
ব্যথা
দেহের কোষে ।
তারপর খালিপায়ে পথ হাঁটা—
ঋষিপুত্রের কমণ্ডলু হাতে নিয়ে দেখেছি
ওখানে রক্ত
কমণ্ডলু সরিয়ে রেখেছি ।
পৃথিবীর কাঙালী ভোজের আসরে ঘুরতে ঘুরতে দেখলাম
আমি ভালোবাসার কাঙাল
পেলাম নারীকে
হারালামও ।
অন্ধকার হ'লে দরিদ্র হয়ে পড়ি
তাই হাঁটা আমার রদ্দুরে ।

রদ্দুর আমার শিরায় মাঝি হ'য়ে এলো
দাঁড় বাইতে পেলাম অনেক মানুষ !
ভালোবেসেছি কেওড়া পাড়ার মানুষ
মণি নদীর জল
তেষ্টা মেটেনি···

ভালোবাসতে বাসতে ভুলপথে জোনাক পাখীর
খোঁজে গেছি বনে—
কেউটে সাপ আমার হাড় দিয়ে বাঁশি বানিয়েছে
বছরের পর বছর অসহ্য যন্ত্রণা
আমি থামিনি ।

আবার ফিরে এসেছি, ফিরে এসেছি ঘরে
তোমাদের কাছে
পেয়েছি ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, কুৎসা ।
রক্তে আমার লুকিয়ে থাকা নারীর মুখ
পেয়েছি, ফিরে এসেছি ঘরে
তোমাদের কাছে ।

অনির্বাণ আলো যদি পৃথিবীর মুখ হয়
আবার যখন ফিরে এসেছি
আস্তে আস্তে আঙ্গুল সোজা ফুল খোলার মত :
ও মুখ আমার হাতে
মুখের আদল আমার হাতে ।

ভারতবর্ষ, ফিরে এসেছি তোমার কাছে
তোমার পুরুষ তোমার নারীর কাছে
আমার পুরুষ আমার নারীর কাছে ।
ভারতবর্ষ তোমার মুখ আমার হাতে
মুখ ধরতে ব্যথা পাচ্ছি, যন্ত্রণায় কাঁপছে শিরা···
মুখ আমার হাতে ।

ভালোবাসার ছা

আমি তোমাদের কাছে ফিরে এসেছি
মানুষ
তোমাদের ঘরদোর উঠোন বারান্দায়
বাতাসে আমার হাত
মাটিতে আমার হাত
তবু কোথায় যেন, কোথায় যেন
শিরার ভেতর তরল লোহার জল
নিঃশ্বাসে গরম জলের ফোয়ারা
ধোঁয়া !
আমার হাত কাঁপছে
জ্বালা
আমার স্বপ্নে বারবার মিশে যাচ্ছে
কাস্তের সাথে শহীদের মুখ !

শান্তির ঘুম, দোলনার ঘুম
বিদায়
গরম শাল গায়ে যারা শীত কাটাবে
বিদায় ।

আমি আবার তোমাদের কাছে ফিরে এসেছি
মানুষ
তোমাদের ঘরদোর বারান্দায়
আমাদের ঘরদোর বারান্দায় !

মানুষ আমার মানুষ
ভালোবাসার ছা
আমাকে একটু জায়গা দাও
একটু রাখবো পা ।

আমার হাতের খঞ্জনী নাও একলব্য

আমার হাতের খঞ্জনী নাও
একলব্য যে তোমরা
মন ঢেলে সুরে তোল ঝঙ্কার
কেঁপে ওঠে যেন যমরা

আমি যে সুরের আলাপ করেছি
তোমরাই কোরো শেষ
আমি যে পথের ঠিকানা পেয়েছি
এইতো আমার দেশ—
আমার মাটি, আমার সাতরাঙা ফুল
আমার গ্রামের দুলে দুলে নাচা সাত প্রজাপতি
ফুলে ফুলে ওঠা মানুষ, পুরুষ, অসংখ্য নদী
রক্তে রক্তে চান করে ওঠা বীরের আরতি
বর্বরের পদধ্বনি, রণজয়ে মেতে ওঠা অসভ্য

আমার হাতের খঞ্জনী নাও একলব্য ॥

পথ হাঁটা বাকি

যারা চিলের চোখ দিয়ে বাঙলার মাটি দেখতে চাও
সবুজ পাতার মাঝে সুখে থাকো, সুখে থাকো !

এখন তারাদের উৎসবে দেবতারা কথা বলে
আমার উৎসব নাই
আমি চলে যাই ।

পাথরে ঘসেছি বুক, আগুন জ্বলেনি

নদীকে বেসেছি ভালো, পরিয়েছি রাখী ;
তোরবার জ্বলে আরো পথ হাঁটা বাকি !

ওরা আমাদের গান গাইতে দেবে না

ভিয়েতনাম, ওরা আমাদের গান গাইতে দেবে না

"আয় চাঁদ আয় না, সোনার কপালে সোনা টিপ্ দিয়ে যা"—
ওদের এই ছেলে-ভুলোনো গানে আমাদের ঘুম আসে না
আমরা নিজেরাই পায়ে পায়ে হাঁটি, কবিতা লিখি, গান গাই—
আমাদের ঘুম আসে না

ভিয়েতনাম, ওরা আমাদের গান গাইতে দেবে না।

আমাদের গানে কালো ভ্যানগুলোর মাথার চুল খাড়া হয়ে ওঠে
আমাদের সুরে কী যাদু আছে জানি না
ওরা ঘুমোতে পারে না।
ভিয়েতনাম, ওরা আমাদের গান গাইতে দেবে না।

আমাদের বুকের মধ্যে শিরায় শিরায় রক্তকণায় গানের চারা
গানকে কখনো বাঁধতে পারে কয়েদখানা ?

কবিতা কখনো শ্মশানে পোড়ে না।

মহারাণীর প্রেমের শহর কলকাতায় গান মানা
ভিয়েতনাম, ওরা আমাদের গান গাইতে দেবে না।

এই কোলকাতায় এই ফুটপাতে

ফুটপাত দিয়ে হেঁটে গেলে কে যেন কানের কাছে গুন গুন করে
ঘরে ফিরে যাও।
ঘরে ফিরে এলে কি কঠিন ভৎর্সনা
এ স্রোতে একটু পাথর নেই যাকে ধরে দুদণ্ড স্থির থাকা যায় !

মিছিলেও সেই এক মুখ, কুমারটুলির এক ছাঁচ
যা চাই যা খুঁজি
সে বুঝি নদীর পাতালে মাছ !

অস্বস্তিতে হাঁটু কাঁপে
কোলকাতার ফুটপাতে আমি পরবাসী !
পাতাল তলিয়ে যাচ্ছে আরো তলে, আরো তলে···

দেখি, ফিসরোল খেতে খেতে
প্লাষ্টিকমাখানো বই কেনে শিশুর জন্যে অরণ্যের নারী
তারই পাশে, ঠিক পাশে মায়ের বুকের লোহা চেটে চেটে
ক্লান্ত জনম সুভদ্রার ছেলে
গেল শীতে ছিল ওর বহুরূতে বাড়ী ।

পাতাল তলিয়ে যাচ্ছে, কবে পথ হবে ?

আমার কবিতায় মায়েদের আনাগোনা

আমার কবিতায় মায়েদের আনাগোনা বড় বেশি
আমার কবিতায় সূর্যের মত মা,
রাত পোহালেই মা ।

করুন সমালোচনা
কথাটা যখন সত্যি
সমালোচনা আমি বুক পেতে নেবই—
জেল গেটে নিমাইয়ের ভাইয়ের হাতে
কবিতার বই পৌঁছে দিতে গিয়েছিলাম
শংকর ওরফে গান্ধীর মার সাথে দেখা :
কাছে এসে বসলেন মা আমার (পাখার বাতাস !)

বিশ্বাস করুন, মায়ের উষ্ণতা
বিদ্যুতের সুতো দিয়ে গাঁথা
একঝাড় ফুলের মত আমাকে জড়ায় !
মা আমার পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন,
"তোমাদের দেখলেও ভালো লাগে"
(আহা কি সুন্দর প্রভাত বেলা !)
আমি শংকরের সঙ্গে ছিলাম, শোনার পরই
মায়ের শিশুর মত গলা : "তুমিও আমার সঙ্গে
চলো।" (আহা কি সুন্দর শিউলি ঝরা !)
মাকে আমার বোঝানো দায় : হোমডিপার্টমেণ্ট
থেকে জেলের সুপার ঐ চ্যালেঞ্জ গেটে দাঁড়িয়ে
আমাকে এখন ঢুকতে দেবে না

মাগো তুমি বোঝ
এই দেশটায় এমন কিছু, এমন কিছু আছে
যা তোমার বুকটার মত টগর বা
গোলাপের গাছ নয়।

মাগো সাপের মুখে পাখীর কুহু কুহু ডাক
শুনতে চেও না।

ছবি

একটি ছবি আঁকতে গিয়ে আমি ঘুমোতে পারছি না
আমার ঘুমের গলায় ফাঁসির দড়ি লটকানো।
শহরের বাসিন্দারা, তোমারা যারা স্বপ্নে রাধাচূড়া কৃষ্ণচূড়া
ফুলের রাতে ভেসে যাও
তারা আমার কবিতা বুঝবে না

মানুষ, তুমি আমাকে একটি ছবি উপহার দাও
যে ছবি আমি আঁকতে পারছি না
সেই ছবি আমার হাতে তুলে দাও।

ট্রাইবুন্যালের ঠাসা ঘরে
বিচারক যখন সবাইকে মুক্ত বাতাসে চলে যেতে
উপদেশ দিলেন
তখন কল্পনা—মেয়েটি হাসছিল
আনন্দে হাত কাঁপছিল!

কল্পনা, তুই তোর ফ্যাকাশে হাতে বন্ধুদের স্পর্শ করে
আবার ফিরে গেলি পরিচিত অন্ধকারে
জেলের জানালা দিয়ে আবার তোকে এত বড় পৃথিবীর মুখ দেখতে হবে

আর আমার বুকে বার বার একটা শব্দ
স্টেথিস্কোপ ফাটিয়ে চীৎকার করছিল, কল্পনা কাজল ওরা যে রয়েই গেলো

কিন্তু পৃথিবীগো যেমন যেমন দেখেছিলাম
দর্শকের হাততালি, কল্পনার ঠোঁটে হাসিখুশি জলের পাশে
তেলের মতো ভাসছে বিষণ্ণতা, কাজলের ফ্যাকাশে চোখের মণি
গলায় আনন্দমালা
আমি পারছি না, কিছুতেই এ ছবি আঁকতে পারছি না।

শেলি কিট্‌স সুকান্তের পৃথিবীতে আমি এতো অসহায়!
কল্পনার ঠোঁটের হাসি, বন্ধুদের বিদায়ের সময়ে আঙ্গুলের থরথর কাঁপা
অথচ উষ্ণতা
কাজলের কালোমুখে বিষণ্ণতার পাশে
লোহার পেরেকে আঁটা মজবুত দৃঢ়তা
আমি এসব দেখেছি, দেখেছি দুচোখ ভরে
কিন্তু পৃথিবীর কাছে, আমার বাঙলা দেশের কাছে
এ ছবি রাখতে পারছি না, পারিনি।

অথচ দায়-দায়িত্বের বোঝা হাতে নিয়ে আমি তো কখনো
দীঘা বা সুবর্ণরেখার বালিতে হাঁটতে যাইনি—
তবে কি ঘুমের নেশায় আমার হাতের রক্ত বেসামাল !
একটু ঘুমিয়ে নিলে সকালের আলো
এনে দেবে কৃত্তিবাস ওঝা !

তবে তাই হোক
ফাঁসির দড়ি ছিঁড়ে ফেলে আমি একটু বিশ্রাম নিচ্ছি
কল্পনা, কাজল
কাল ভোরে আমি তোমাদের জন্য উঠবো ।
আমি কথা দিলেম বোন, কথা দিলেম ভাই ;
আমার কথা মাটি থেকে নীলিমার গায়ে নিশ্চিন্তে দোলাতে জানে হাত ।
আকাশ ভরে ঘুমিয়ে নিচ্ছি একটিবার ।
তারপর এছবি আমি আঁকবই
সূর্য্য, আমি তোমার রামধনু চাই না
শুধু ভোর হলে নাড়িয়ে দিও বাতাসের মতো
শিউলি গাছের পাশে বাতাস যেমন অপেক্ষা করে
ভোর হলে নেড়ে দেয় ।

কল্পনা, কাজল
যারা বুকের ব্যথা আর যন্ত্রণাকে বন্ধুদের শুভদিনে
জ্যোৎস্না দিয়ে ঢেকে দিতে জানে ।
মানুষ, তোমরা অন্তত আমার এই অসমাপ্ত, অসম্পূর্ণ
ছবির পাশে এসে দাঁড়াও, একে রক্ষা করো
আমি কালই ভোরে তোমাদের
কল্পনা, কাজলের পাশে দাঁড় করিয়ে দেবো ।
অনেক যুগ তো মোনালিসা দেখে দেখে অভ্যস্ত চোখ
এবার চোখ জ্বলছে ক্রোধে, তার নীচে ব্যথা
বুকে ফুটছে কাঁটা, মুখের কোষে কোষে যন্ত্রণা
অথচ ঠোঁটের কোণে অসমাপ্ত জ্যোৎস্নার খেলা
শুধু হাতে বন্ধুদের হাত ভরে দিয়ে, বুক ভরে দিয়ে চলে যায় অন্ধকার সেলে·

কেউ যেন না কাঁদে

সাঁজের আলে দাঁড়িয়ে আছি
নদীর পারে একা
ডুবদিয়ে কে চলে গেলো
আর হোলনা দেখা।
চোখের স্নায়ু অন্ধকারে
কেঁপে বেড়ায় নদীর পারে
গোষ্ঠে রাখাল চলে গেলে
কে তুমি দাও আলো জ্বেলে—
চাঁদ, পূর্ণিমা চাঁদ
এবার আমার একটি চোখ
হাজার চোখ
পাহারা দেবে রাতে
নদীর সাথে
হাত বাড়াবে চাঁদে

কেউ যেন না কাঁদে।

খেলো, খেলো

আগুন নিয়ে খেলছো বীর
খেলো, খেলো

শুধু মনে রেখো
আগুন পোড়াতে পারে
পাহাড় পাথর
গলাতে পারে লোহার শিক
গলাতে পারে সোনা

আগুন নিয়ে খেলছো বীর
খেলো, খেলো
শুধু মনে রেখো
এ নয়, কক্ষনো নয়
রূপোর কাঁটায় উলবোনা

বাছার মুখের রক্তে, পিদিম আমার অস্তে

আহা, বাছার আমার ঠাণ্ডা লেগেছে
দয়াকরে ডাক্তারবাবুরা যদি ওষুধ দেন
বাছা আমার ছেঁড়া কাঁথা ছুঁড়ে.
আবার আমতলা জামতলা করতে পারে।

নদী এখন শুকিয়ে আছে
যত রাজ্যের বকপাখীর সাদা পালক
গজিয়ে ওঠা ঘাসের ভেতর ভেসে বেড়ায়।
ডাক্তারবাবু, ছেলেটাকে আমার সারিয়ে দিন
উঠোনে ওর পেয়ারা কাঠের গুলতি দুটো ঝুলছে
ও সেরে উঠবে, নদীতে যাবে
রোজ দুপুরে বকপাখীর মাংস খাব বাপেপোয়ে!

ডাক্তারবাবু, দিন গড়ায়, সাঁজের বাতাস সারি সারি
কেমন যেন শবের গন্ধ, আমার ভয় করে!
ডাক্তারবাবু, বাছার আমার শরীর আগুন—
হায়রে, পিদিম আমার নিভে গেল!
বাছার মুখের রক্তে
পিদিম গেল অস্তে

ডাক্তারবাবুরা যুগ যুগ বাঁচুন
ঝাড়লণ্ঠন আহা রাজ্য জুড়ে !
হাসপাতালগুলো চাঁদ হয়ে যুগ যুগ জিও
আমি বাছার গুলতি নিয়ে, মরা দেহ কোলে নিয়ে
চলছি নদীর কাছে।

বকপাখী ঐতো বসে ঘাসের পাশে
আমার পেটে আগুন
বাছার রক্তে পিদিম নিভে গেছে…
গুণগুনিয়ে বাতাস বলছে, "বাপ, ঐতো পাখী
ঐতো সাদা পাখী—,
বাপ, তুই চোখ থাকতে কানা ? গুলতি ছোঁড়…"
মরা ছেলে রইলো পড়ে নদীর ধারে
আমি ছেলের গুলতি নিলেম হাতে
ন্যাংটা দুজন শবযাত্রী মরাবকের পাখার জন্য ছোটে…
বাতাস বলছে, "বাপ, তুই পা থাকতে খোঁড়া" ?
আমি বাতাসের গায়ে লাথি মারতে মারতে নদীতে দিলেম ঝাঁপ।
পাড়ে দুজন শবযাত্রী ন্যাংটা ছেলে বুক ফুলিয়ে হাসে
ওরা দুজন আমার বাছার বক মারার সাথী।

নদীর জলে মানিক ছুঁড়ে ফেলে
মরা বকের মাংস নিয়ে ফিরছি আমি ঘরে
পেছন পেছন শবযাত্রী ন্যাংটা দুটো ছেলে
ওরা দুজন আমার বাছার বক মারার সাথী।

লোডশেডিং আর আমরা

আমার ছেলে বেলুন ওড়ায়
চাঁদকে বলে 'মামা'।
আমি ওড়াই অন্ধকার
অন্ধকারেই আমি দিচ্ছি হামা।

একটা সাইকেল ও প্রমিথিউস

একটা সাইকেল ঘন্টি বাজিয়ে দ্রুত নেমে যাচ্ছে মেঠো পথে
পেছনে একটা মোটর, একটা মিলিটারী ভ্যান।
একটা সাইকেল ঘন্টি বাজিয়ে দ্রুত নেমে যাচ্ছে মেঠো পথে
পেছনে একটা মোটর, একটা মিলিটারী ভ্যান।

একটা গল্প বলি শোন—
স্বর্গের রাজা ছিলেন জিউস
প্রমিথিউস রাজার শত্রু, রাজদ্রোহী।
প্রমিথিউসের চোখে আলো, বুকে আলো, হাতে আলো
আলোময় প্রমিথিউস।
জিউস প্রমিথিউসকে পাঠালেন পাতালের অতল গর্ভে—
অন্ধকারে, অন্ধকারে, অন্ধকারে।
সাতাশ বছর প্রমিথিউস অন্ধকারে, অন্ধকারে, অন্ধকারে।

তারপর প্রমিথিউসের চোখে আগুন, বুকে আগুন, হাতে আগুন
আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ দিয়ে বেরিয়ে এলেন প্রমিথিউস সমতলে।
প্রমিথিউস ছুটছেন, ছুটছেন মানুষের কাছে, মানুষের কাছে
পেছনে জিউস, জিউস, জিউস।

একটা গল্প বলি শোন—
একটা সাইকেল ঘন্টি বাজিয়ে দ্রুত নেমে যাচ্ছে মেঠো পথে
পেছনে একটা মোটর, একটা মিলিটারী ভ্যান।

একদিনতো হিটলারের স্বস্তিকাচিহ্নে মিশে গিয়েছিলেন রাজা জিউস
বন, বার্লিন, মাদ্রিদ ভেসে গিয়েছিল কমিউনিষ্টদের রক্তে—
তারপর একটা ছারপোকা পৃথিবীতে পা-রাখার মত যতটুকু মাটি চায়
তাও পেলোনা হিটলার, পেলেন না জিউস।

একটা গল্প বলি শোন—
মহাভারতের গল্প
পূব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ দিয়ে
একটা সাইকেল ঘন্টি বাজিয়ে দ্রুত নেমে যাচ্ছে মেঠো পথে
পেছনে একটা মোটর, একটা মিলিটারী ভ্যান ॥

এ বধ্যভূমি আমাদের সোনার সিংহাসন ?

আমরা কোথায় আছি ? এ বধ্যভূমি আমাদের সোনার সিংহাসন !
রুটি আর গমের থলেগুলো যখন হাল্কা হচ্ছে
কলকাতা শহর যখন মোমবাতি হাতে দাঁড়িয়ে আছে
বাসন্তীর লাটে ক্ষুধা ছৌনাচের তাল গুনছে
বালিগঞ্জ স্টেশনে লম্পটের পায়ের শব্দ…
জননীরা পালাও, যুবতীরা তফাৎ যাও।

আমার কবিতা অভিমন্যুর তীরের ডগায় কাঁপছে।
আমার প্রতিটি স্বপ্নের সামনে রেডলাইট
অথচ আকাশে সাদা রুটির মত যত আলো দেখা যায়
তার চেয়ে বেশি আশা আমার বুকে।
দাঁত ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায় প্রতিবাদ
দুঃখে শোকে ক্রোধে পায়ের নখ থেকে মাথার চুল
কাঁচা কয়লার মত জ্বলছে প্রতিদিন, প্রতিমাস, প্রতিবছর…

রাবণের চিতার মাপ আমার বুকের মাপে বুঝি গড়া হয়েছিল !

আমরা কোথায় আছি ? এ বধ্যভূমি আমাদের সোনার সিংহাসন ?

খুকুমণি

আমার বুক ভেঙ্গে দাও খুকুমণি
ট্রেনের কামরায় ঐ নামেই আমি তোমায় ডেকেছিলাম যে

বারুইপুরে পেয়ারা কিনে বেজব্রীজে বেচে
পঁচিশ পায়সা লাভ
পায়ের তলে সাপ।

তবু বল্লে মিষ্টি হেসে
রাইবেশে
চোখের মণি স্থির ;
বাড়ী ফিরলে
ঐ মণিতে মেঘ জমবে
বৃষ্টি ঝিরঝির।
পেটের আগুন   বুকের কান্না
এই তো আমার খুকুমণির একটি দিনের রান্না।

আমার বুক ভেঙ্গে দাও খুকুমণি
ট্রেনের কামরায় ঐ নামেই আমি তোমায় ডেকেছিলাম যে

একি লজ্জা, একি লজ্জা
রাত্তিরেতে চাঁদের আলো খুঁজে পাচ্ছি নে
একি রাত, একি রাত
চুপড়ি মাথায় চাঁদ !

কবির মেলা, কবির থান
কত কবির গান
তবু রাত, একি রাত
খুকুমণির দু'চোখ ভরে রাত !
চুপড়ি খুলে আসবে কবে
খুকুমণির কাছে তুমি চাঁদ ?

এ ব্যথা আরো অন্তপুরে

গিলোটিনে ব্যথা লাগে
কিন্তু এ ব্যথা আরো অন্তপুরে ;
সেখানে ডুবুরী জাহাজের স্পর্ধা বেপরোয়া—
মন্দিরে, হরিদ্বারে সহস্র বলি
কি ভীষণ অহঙ্কারী আমার স্বদেশ !
কার্তুজ তৈরী হয় গীতা আর বেদান্তের প্রকাশনালয়ে
রাজপুত মশালে পোড়ে চন্দ্রকলা হরিজন নারী
অথচ গাড়ী ঘোড়া ট্রাম বাস কাক ডাকলে ছোটে
ধর্মঘট রাজবন্দী
সেলুলার জেলে !

গিলোটিনে ব্যথা লাগে
কিন্তু এ ব্যথা আরো অন্তপুরে ।

আমাদের ছন্দ আমাদের গান

যারা ঘুমোতে পারছনা আমার মতো
মানুষ । আমার পাশে এসো
অথবা তোমাদের শিমুল চোখের কাছে আমি যাই

রক্তের ছন্দ আছে সুস্থ মানুষের ।

জহ্লাদের দেশে অসুখ থাকবেই ।
তাই রক্তাক্ত ছন্দহীন মানুষেরা
অসুস্থ মানুষেরা এসো আমার পাশে
না হয় তোমাদের পলাশ দেহের কাছে আমি যাই ।

পাঁচটি আঙুল আমার পাথরের গায়ে বসে
পাথর হয়েছে।
তোমরাও যারা আমার মতো
এসো পাথর সরাই।
কড় কড় শব্দে ভেঙ্গে যায় দু একটা দাঁত ;
যায় যাবে : এইতো আমাদের গান।
ফাঁসীর মঞ্চ যেখানে আয়নার মত প্রতি ঘরে ঘরে
সেখানে দেহের প্রত্যেকটি কোষে ছন্দহীন রক্তপাত :
আমাদের ছন্দ, আমাদের গান।

এসো, এসো

যারা আমার সকালবেলা
যারা আমার প্রিয়
পশর নদীর ঢেউয়ের মধ্যে
আমায় খুঁজে নিও।
মধ্য রাতে ঢেউয়ের সাথে
টগ্ বগ্ বগ্ টগ্ বগ্ বগ্ খুরে
স্রোতের স্বরে
আমার যাওয়া আসা
ভালোবাসা ভীষণ গভীরে
পাথরগুলো সরিয়ে রাখি তীরে !

তোমরা যারা ভাটির টানে নড় চড়, কেঁদেও কাঁদো না
আমার মত নদীর মত রাত্রে ঘুমোও না
এসো এসো ঘর বেঁধেছি জঙ্গলে
ঘর বেঁধেছি পশর নদীর জলে।
দুঃখে সুখে পথে পথে গান বেঁধেছি রক্তে
খুঁজবে যখন খুঁজতে এসো পশর নদীর স্রোতে।

তোমরা যারা নিমন্ত্রণের আহ্বান মানো না
এসো এসো
আমার মত নদীর মত রাত্রে ঘুমোও না।

হরির লুটের দেহ

হরির লুটের দেহ—মরা মানুষটার উপর পয়সা ছিটোচ্ছে
কিছু মানুষ।
মাথার কাছে শুকনো পাঁউরুটি, কিছু পরিষ্কার জামা কাপড়
কপালে, মুখে, বুকে, পেটে মাছির মত ভন্ ভন্ করছে কিছু পয়সা!
কোলকাতার মানুষের কৃপায় মৃত মানুষটি এখন শুকনো পাঁউরুটি
কিছু পরিষ্কার জামা কাপড় আর দু'টাকার মত খুচরো পয়সা
ইচ্ছে হলেই হাত বাড়িয়ে নিতে পারে!
অথচ মানুষটা মুখ্যমন্ত্রী, বিরোধীদলের নেতা, অনেক শিল্পী
কত কবির বাসস্থান এই কোলকাতায় অভুক্ত সাতদিন সাতরাত
ফুটপাতে।

চাঁদের আলো লোকটাকে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে শহরে ;
বাড়ী ক্যানিং। রাত দুটোয় চাঁদনীরাতে
পথ হেঁটেছে, মাঠ পেরিয়েছে, সাঁকো ডিঙ্গিয়েছে
তারপর ইষ্টিশন, ইষ্টিশনের পর ইষ্টিশন
ইষ্টশনের পর ইষ্টিশন···

চাঁদ আর চাঁদিনীরাত লোকটাকে সিগ্ন্যাল পোষ্টের গায়ে বাড়ি মারতে মারতে
ইষ্টিশনের পর ইষ্টিশন পার করেছে!

হায়, লোকটা দুর্ভিক্ষের আয়নার উপর দাঁড়িয়ে!
লোকটা কোলকাতার ফুটপাতে শুয়ে পৃথিবীর তিনভাগ জলে ডুবে গেল!

লোকটা মরার আগে জেনেও গেল না
হরির লুটের বাতাসা হয়ে জন্মেছিল সে।

কোলকাতার তুলসী মঞ্চে পুণ্যার্থী মানুষ এসে দাঁড়া
বল হরিবোল, বল হরিবোল, হরির লুটের দেহ।

তোমাকে ভালোবাসি প্রতিভাদি

তখন আমার বয়স দশ ছুঁই ছুঁই
ভোরবেলা প্রতিভাদি আমাদের বাড়ীতে এলেন ;
নীলপেড়ে সাদাশাড়ী
ছিন্‌ছাম
রোদ্দুরে পোড়েনা সূর্য্যমুখী
চোখটানলে দেখা যায় আয়নায় রক্ত নিশান ;
প্রতিভাদি সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন,
দিদিকে বললেন, 'তুই কিন্তু একটু আগেই মিছিলে যাবি'।
সাঁজের নদী প্রতিভাদি ঝড়ের মত এলেন
ভেতর বাড়ীর স্নায়ুর তারে মাঝদরিয়ার বাতাস রেখে চলে গেলেন
সূর্য্যের রথের চাকা হাত ধরে ঠেলে রাখে পলাশী কোলকাতা।
লাল ফুল কোলকাতা ;
পাপড়ী ছিঁড়ে নিয়ে যায় উদ্‌ভ্রান্ত বাতাস।
বাঙলার বুক চিরে কেঁপে ওঠে সাইরেন শিস।
ফ্যাকাশে দিদির মুখে লাবণ্য পুড়ে ভস্ম-ছাই
বৌবাজারে প্রতিভাদিকে গুলিকরে মেরেছে পুলিশ।

আমি কোনদিন কবিতা লিখেছি কিনা মনে নেই
সাদাশাড়ী নীলপাড় প্রতিভাদিকে আমি ভালোবেসেছিলাম।
খুব একটা আমার দিকে মনোযোগ দিতেন তাও নয়
খুব একটা আমার সঙ্গে গল্প করতেন তাও নয়।

মনোযোগী ঝড় নয় প্রতিভাদি
তবু আমি ভালোবেসেছিলাম—
ঝড়ে জলে পদ্মার কসাই স্রোতে কবজি ডুবিয়ে দেখেছি,
আমি অনভ্যস্ত রাগে বেজে উঠি
তাই এই ভালোবাসা
জরায়ুর মুখে নড়ে উদ্ধত যীশু!
বাড়ীতে কেউ জানল না
রাতভোর আমার চোখে ছিল গঙ্গোত্রীর দাপট।
ভোরবেলা একটা সাদা খাতায়, নীলপেন্সিলে
প্রতিভাদিকে কবিতায় এঁকে নিলাম:
সাদাশাড়ী নীলপাড়, ভেতর শরীরে ঝড়
এই ছবি আমি দশ বছর বয়সে এঁকেছিলাম!

প্রতিভাদি তোমাকে ভালোবাসতে বাসতে
আরো তিরিশটা বছর পার হয়ে গেছে;
ভিখিরির শূন্য থালা আকাশের চাঁদ
প্রতিটি শস্যের নিচে শকুনের চোখ
খবরের কাগজগুলো দুটাকায় কেনা গর্ভবতী
কামধেনু বন্যা নামে জননীর কোলে
লক্ষ শিশুর লাশ
নিজেরাই হেঁটে যায় শ্মশানে মশানে!
ঘুমঘোর কুসুমের পাশে অনিদ্রা;
সূচাগ্র মেদিনী আমি দেবনা কুসুমে
এ শপথ মজ্জার গভীরে মগ্ন শীলাবতী।
পৃথিবীতে চিরদিন শকুনের চোখ উপড়ে ফেলে গেছে নদী

তাই আজ সাদাশাড়ী, নীলপাড়, ভেতর শরীরে ঝড়
তোমাকেই ভালোবাসি প্রতিভাদি।

আমাকে ভয় দেখাসনা আহাম্মক

আমাকে ভয় দেখাসনা আহাম্মক

মা বলে ডাকতে ভালোবাসি
বোন বা প্রিয় দেখলে হাসি

আমি বাঁচতে জানি, মরতে জানি
পাথর ভেঙে হাসতে জানি
এই তো আমার রোগ

আমাকে ভয় দেখাসনা আহাম্মক।

এ কালবেলায় কোন দ্বিতীয় মঞ্চ নেই

এখন স্বস্তিকাচিহ্ন তোমার চোখের পাশ দিয়ে ঘুরবে ;
দুটো প্রজাপতি হাতে নিয়ে কথা বলে দেখো
সে তোমাকে তাই বলবে ;
কালবেলা ভারতী তোমার গায়ে।

'রোদের জোয়ার ভাটা আছে আমার শরীরে'
এক পাগল আমাকে বলে গেল কাল ;
এখন আমার মনে হয়, পাগলের বুক অব্দি মাটির পরাগ মাখা
ওর বুকের ভেতর সূর্য্য ওঠে, সূর্য্য অস্ত যায়।

কালবেলায় আমি সেই মানুষ পাগলের চোখ লাল হতে দেখি
সূর্য্যাস্তের পরেও বুঝি আগুন জেগে থাকে !

এখন স্বস্তিকাচিহ্ন তোমার চোখের পাশ দিয়ে ঘুরবে ;
সেই মানুষ পাগলের লাল চোখ নিয়ে
যদি রাতকে বেলুনের মত ওড়াতে না পারো
এ বেলায় সরে পড়ো ।

এ কালবেলায় মঞ্চে কোন দ্বিতীয় মঞ্চ নেই
যেখানে ঘুরবে ।

আমার লজ্জার রঙ নীল, আমার লজ্জার রঙ রাত

মাথার উপরে প্লাগপয়েন্ট, আলো, সব ঠিক আছে
তবু মাঝে মাঝে ঘরের ভেতর ঢুকে তলোয়ার খেলে যায়
শঙ্খশুভ্র দুতিনটি হাত !
খেলো, যাও, চলে যাও মেঘের ভেতর
ওখানেই তোমার ঘরবাড়ী, বারান্দা, রেলিং সবকিছু ।

ইচ্ছে পুরণের দেশে জন্ম হয়নি আমার
প্রতিরাতে গাছ থেকে চুরি যায় ডালিম, ডালিম পাতা, ডালিমের ফুল
কত ঋতু বয়ে গেল একবারও মনভরা ফলন হোলনা গাছে !

মাঝে মাঝে ঘরের ভেতর ঢুকে তলোয়ার খেলে যায়
শঙ্খশুভ্র দুতিনটি হাত ;
জননী অহল্যা,* তুমিতো শুভ্র হাতে রেখেছিলে হাত
আমরা কি তবে তিরিশ বছর ধরে সেই হাত পুড়িয়েছি ?
তাই আজো বিদ্যুৎ খুঁজে যায় জননীর হাত !

আমার লজ্জার রঙ নীল, আমার লজ্জার রঙ রাত ।

* অহল্যা : কাকদ্বীপের সংগ্রামী জননী অহল্যা গর্ভবতী অবস্থায় পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেন ।

পুরস্কার

রাত জাগা, রাতের পর রাত নীল নীল সাঁকো পার হওয়া
পথে যেতে যেতে টগবগ করে ফুটছে আমার রক্ত,
মজ্জার গভীরে একশোটা সূর্য্য আমাকে ঠোকরাচ্ছে ;
রেখে দাও তোমাদের ছেলে ভুলোনো গান, ভালোবাসার গান
আমার বুক পকেটে অনেকগুলো ভালোবাসার চাঁদ আস্তানা গেড়েছে
আকাশের চাঁদ আর একটি মেয়ে কত আর আশ্বাস দিতে পারে !
চাইনা তোমাদের আশ্বাস, চাইনা তোমাদের জন্ম দিনের নিমন্ত্রণ
আমার কোন জন্মদিন নেই, আমি হাঁটছি, আমি নীল নীল সাঁকো পার হচ্ছি
এই আমার পরিচয় ।

আমি কোন ভিসা অফিসের সামনে ধর্না দেবো না ;
পাহাড় পড়লে পাহাড় ডিঙোবো, নদী পড়লে নদী পার হবো ।
কুললক্ষ্মী আর সংসারকে চেন দিয়ে বেঁধে রাখার কোন মন্ত্র
আমার জানা নেই ।
ঝড়ের মেঘের মতো বাস্তুহারা আমার শৈশব, আমার যৌবন
আমার সবকিছু ।

মজ্জার গভীরের সূর্য্যটা আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে :
প্রতিটি ফুটন্ত সকাল আমি নিদ্রাহীন চোখে দেখেছি
দেখেছি ফুলের কুঁড়ির থেকে মধু নিয়ে গেছে মৌমাছি নিদ্রাহীন চোখে

কেউ এখন আমাকে ঘুমোতে বললে আমার হাসি পায়
সূর্য্যের ভেতর কেউ ঘুমিয়েছে কোনদিন !

থাক সূর্য্য, ঘাঁটি গেড়ে থাক
আমৃত্যু ঘুমোইনি, এই হোক জন্মের পুরস্কার আমার !

আমার কোলকাতা

(শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়কে)

এক বুক ঠাণ্ডাজলে সকল সুন্দরীরা ঘুম ঘুম,
ঘুমিয়ে আছেন কিনা জানিনা এখনো।
শুনেছি, সুন্দরীরা ইঁদুর ধরেন
তাই কোলকাতায় এতো ইঁদুরের আনাগোনা
এমনকি সুন্দরীরা বুকের ভেতর মরা ইঁদুরের বাসাও ভাঙ্গেনা।

তবু একবুক অন্ধকারে সকল সুন্দরীরা
ঘুম ঘুম চোখে ইঁদুর ধরেন কিনা জানিনা এখনো।

পঁচিশ বছর কোন মিছিলে কয়লাখনির কামীন দেখিনি!
কালো কালো পাথরের মধ্যিখানে সোনাবুটি চোখ,
দেবুদা তোমার সেই সাঁওতালী মেয়ে কোথায় জানিনা!

তাই বাবুদের বাবুঘাট ছেড়ে নদীদের সাথে ঘুরি ভারতবর্ষে
ছুটন্ত হরিণের সারা গায়ে আগুন ধরিয়ে খুঁজি কোথায় প্রমীলা!

একবুক অন্ধকারে সকল সুন্দরীরা
ঘুম ঘুম চোখে ইঁদুর ধরেন কিনা জানিনা, বলতে পারি না।

এখন এক নদী থেকে আরেক নদীতে আমি।

আমার চোখে কোন চন্দনের কাঠি নেই
রোমকূপে নেই কোন স্বপ্নের তারা
খোঁচা খোঁচা দাড়ি, অগোছালো চুল, চোয়াল মাংসহীন
মধ্যিখানে ছুটন্ত হরিণ;
হরিণের সারা গায়ে আগুন ধরিয়েছি আমি।

জ্বলুক, জ্বলুক আগুন, খাল, বিল, চিতলের চিতা
নদীর বা হাত ধরে খুঁজে নিয়ে আসি আমি আমার কোলকাতা।

আপনি বলুন, আমি শুনব

কথা বলতে বলতে যখন বুকের চন্দ্রবিন্দুও শেষ হয়ে যায়
তখন ভয় হয়
মন্ত্রী বা পলিটব্যুরোর মেম্বারের চেয়ারটা এগিয়ে আসছে না তো!

একই বন্ধুদের সাথে কথা বলছি দশটা বছর
যেন রুদ্রাক্ষের মালা
ঘুরে ফিরে একই রুদ্রাক্ষ ফল!
তাই এখন একটু অপরিচিতরা আসুন না!
জানি, আপনি কোন মহামানব নন
সাধারণ জামাকাপড়-পরা মানুষ—
চাতকের মেঘ দেখার উপমাকে ম্লান করে দিয়ে
আমি আপনার মুখের দিকে চেয়ে আছি;
আপনি বলুন, আমি শুনব।

আমি আমার নারীর মুখও এমন দেখি নি।

ঘুমিয়ে পোড়োনা

ক্রোধকে বালিশের নিচে রেখে ঘুমিয়ে পোড়োনা।
নিজের বুকের আগুন পুড়তে দিয়ে বসুমতি ঘুমিয়েছিলো
জাগরণে চোখ খুলে দ্যাখে সূর্য্য, তারা, পাহাড়, নদী
যে যেখানে ছিলো সব ঠিক আছে
শুধু তাঁর নিজের হাতে আঁকা
আগুন হাতে মানুষের ছবিটাই চুরি হয়ে গেছে!

তাইতো আবার দেখি
মাটির সরা নিয়ে বসেছে পিকাসো, বসেছে বসুমতি।

চোখের ভেতর চাবুক চালায় রাত

বিষ গিলিয়ে কেউ আমাকে মারতে পারেনি।
রাজা, তোমার দেওয়া বিষণ্ণ বিষ পাহাড়
রক্তে আমার হাসতে গিয়ে কাঁদে।
চামড়া টেনে চোখের ভেতর চাবুক চালায় রাত ;
সোলার চাবুক

আমার চোখের মণি একটু নড়েনা
পাথর শুধু পাথর, একটু কাঁপেনা।

তোমার চাবুক অস্ত্রাগার থেকে একটার পর একটা বার কর
আর আমি রাতকে বেলুনের মত ওড়াতে ওড়াতে
শিশুর মত হাসি
রাজা, তোমার বেলুন নিয়ে খেলতে আমি ভীষণ ভালোবাসি।

অন্ধ মানুষের নামতা

(ভাগলপুরে জেলবন্দীদের অন্ধ করে দেওয়ার কথা মনে রাখে)

ওদের অন্ধ করে দাও :
পল্লবের কণ্ঠ ধরে ঝাপ্টা মারে ফ্যাসিস্ট বাতাস—;
নদীও কুঁকড়ে আসে, ওর বুক বুঝি গভীর ছিলোনা কোনদিন
জলের ভেতরে মাছ রক্তশূন্য
ভারতবর্ষ জুড়ে ক্রৌঞ্চেরা যন্ত্রণা বিছিয়ে দেয় !
এ এক অদ্ভুত সময় !

ওদের অন্ধ করে দাও :
পল্লবের কণ্ঠ ধরে ঝাপ্টা মারে ফ্যাসিস্ট বাতাস ;
পুড়ে যায় শ্যামল শস্য, মাঠ, পাহাড়িয়া সেগুনের পাতা
পুড়ে যায় অন্ধমণি, পুড়ে যায় আকাশে ঝোলানো রোদ
ঝোলানো রাঙ্‌তা

কোথায় তোরষা, তিস্তা
তোমাদের পায়ে বাঁধা পাথরের মল ঝুম ঝুম
বাজেনাতো আর !
তবে কি সবাই অন্ধ !
তবে কি বাঘের মুখের ভেতর ষাটকোটি মানুষের চোখ, নদী
পাহাড়িয়া সেগুনের পাতা, আকাশে ঝোলানো রোদ, ঝোলানো রাঙ্‌তা

নদীকে বলছি, নদী
তোরষাকে বলছি, তোরষা
তিস্তাকে বলছি, তিস্তা
কোন মানুষ বা দেবতা গড়েনিতো তোমাদের
ঋণমুক্ত, ভারমুক্ত, উচ্ছল স্বভাবে
আকাশকে চুমো খেতে খেতে সমতলে এসে মাটিকে খোদাই করেছো তোমরা।
উদ্যান নিজেদের হাতে।
কতরাত, কতদিন হাতুড়ী, বাটালি আর হৃদয়ের মধু মিলেমিশে
একাকার সমতল—হলুদ নদীর খেলা
পায়ে বাঁধা পাথরের মল ঝুম ঝুম
ঝুম ঝুম কত কথা মানুষের সাথে বাঁচবার।

তবে কেন শিল্পীর পরাজয় আজ !

এসোনা প্রকৃতি ও মানুষ সবাই মিলে জুম চাষে জড়ো হই
হোকনা কঠিন চাষ
হৃৎপিণ্ডে ঘুঙুর বেঁধে ছুটে আসে এ কোন আকাশ !
এ কোন বাতাস !

ক্রান্তিকাল আমি আর যাব না হাসপাতালে

অনেক ফুলের রেণু—বালক অমলেশ, অরুণের মা, প্রশান্ত অলোকের বোন
আমার মুখের নির্জনতা চায়!
আমি আর যাব না, যাব না সেখানে;
আমি আর যাব না হাসপাতালে।
জীবনে নোয়ানো নৌকো ক্রান্তিকাল, আহা ক্রান্তিকাল
আমাকে সবুজ আমের বনে নিয়ে যাও!
আমি আর যাব না সেখানে;
আমি আর যাব না হাসপাতালে।

কতবছর, হাজার বছর ধরে ইষ্টিশন দেখিনি তো আমি।
পাশাপাশি খাটে শুয়ে অমলেশ, অরুণের যন্ত্রণা সয়েছি।
রোববার, রোববার ছুটির দিনগুলো
হাসপাতালে, বৃদ্ধমাছের মতো ক্লান্ত হয়েছি।
সূর্য্যের ক্লান্তির ভারে মাঝরাতে আকাশকেও অরুণের মা'র মতো
নীল হতে দেখি।
হাজার বছরের দেহ, এত বড় হাজার বছরের দেহ আমাদের
যাহা সমুদ্র হোত, আদিম সূর্য্য,
ক্রীতদাসের মতো, গাছের ছায়ার মতো কাঁপতে দেখেছি।

আমি আর অন্ধকারে একক দাঁড়ায়ে নির্জন নির্ঝরিনী প্রসব করব না।
মৃত্যুকে ক্ষয় হতে আমি আর কখনো দেব না।

হাজার বছরের পুরনো গলায় হাত দিয়ে আমি আর যাব না সেখানে;
ক্রান্তিকাল, আমি আর যাব না হাসপাতালে।

দেখে যা আলেকজান্ডার, দেখে যা

আমি কোলকাতার উপর দিয়ে বিজয়ীর মতো হাঁটছি
দেখে যা আলেকজাণ্ডার, দেখে যা !
শিমুল তুলোর মতো উড়ে গিয়ে
মেঘের পাঁজর ধরে দোলাচ্ছি আমি
দেখাচ্ছি খেলা, এক-আঙ্গুলের খেলা—
চারটি আঙ্গুল অশ্বমেধের ঘোড়ার চারটি পা ;
এক আঙ্গুলে প্রজাপতির বুক ঘসটে দিই
ওরা রঙ্গীন জলে ডুবতে ডুবতে পাষাণ প্রেমের খেলা খেলে
হোটেল, বার, ডাস্টবিনে—
নষ্ট প্রজাপতি ;
তারই কষ চুঁইয়ে চুঁইয়ে কোলকাতা পচে ওঠে ।
আমার হাতে টাওয়েল, ক্লিপ, নিড্‌ল, ফরসেপ্‌, ছুরি ।
আমি অপারেশন টেবিলে কোলকাতাকে রেখে
মিছিল করি না, বক্তৃতা দিই না
নির্দ্বিধায় ছুরি চালাই ঃ
খসে পড়ে শহরের পচা মাংস
হাসপাতালের নর্দমা বেয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে বয়ে যায় পুঁজ রক্ত
রবীন্দ্র সদনের পাশ দিয়ে ।

আজকাল দেখি, গঙ্গা আমায় হিংসে করে
আমি ওকে ভালোবাসিনা বলে ।
সাক্ষীগোপাল ঘট, কোথায় ছিলো চোখ ?
আনবাড়ী গিয়ে তুমি কাকে দিচ্ছিলে চুমু ?
এদিকে কোলকাতা পচতে পচতে ঘা
না, আমি তোকে ভালোবাসিনা, ভালোবাসিনা ।

আমি কোলকাতার উপর দিয়ে বিজয়ীর মতো হাঁটছি
দেখে যা আলেকজাণ্ডার, দেখে যা !

কবর থেকে উঠে এসে

কবর থেকে উঠে এসে তিনি আবার ভয় দেখাচ্ছেন : ঈশ্বরী।
আসলে যারা কফিন কাঁধে নিয়েছিলেন, তারা মূর্খ
আসলে যারা কবরে মাটি দিয়েছিলেন, তারা মূর্খ ;
তারা জরি আর জড়োয়া দিয়েছিলেন
কিন্তু আমাদের ভাত, আমাদের রুটি
বুনো প্রজাপতি
পাহাড়ী মহিষের মাস
আমাদের রক্ত থরে থরে সাজিয়ে দেননি
মুখ থেকে জরায়ুর ময়ূর পালঙ্কে ;
যাতে তিনি ঘুম থেকে উঠেই
বত্রিশটি দাঁত লেন্সের সামনে মেলে
বাদুড়-পাখার মত হাল্কা হয়ে
উড়ে যেতে যেতে, পাক খেয়ে আহ্লাদী হতে পারেনি।
তারা নরম তুলোর পালঙ্ক দিয়েছিলেন
কিন্তু গঙ্গা, গোদাবরী, কৃষ্ণা, ব্রহ্মপুত্র কাঁধে নিয়ে বেড়াচ্ছে
এমন যে দেশ, যে দেশের প্রতি রোমকূপে
লেদ আর ঈগলের ধারালো কামড়
যে দেশের প্রতিটি খুনের সঙ্গে দৌড়চ্ছে একটি মন্দির
সেই দেশ ভারতবর্ষ ফারাও মহিষীর সঙ্গে দেননি
যাতে তিনি সমুদ্র গর্জনের নির্দেশ দিতে পারেন—
প্রতিটি নিঃশ্বাসের জন্যে খাজনা,
শিশুর একপা হাঁটাও লক্-আউট
মিলিটারি ব্যারাক আর পুলিশ ফাঁড়িগুলি
গাঁয়ে গঞ্জে আকুন্দ বা বুনো ফুলের মুখ ঘসটে, বুক ঘসটে
গজিয়ে উঠুক গর্ভবতী বাঘিনী।

তাই কবর থেকে উঠে এসে তিনি আবার ভয় দেখাচ্ছেন : ঈশ্বরী

যৌবন

আমার আর যাওয়া হোলো না
শেষমেশ যৌবনই জিতে গেলি !
ডুমুর, শালুক, বকফুল, যা-ই নিয়ে আসুক না গাছ থেকে
মনে হয় হাতে ক'রে ধরিত্রী নিয়ে এসেছে !
প্রতিটি আঙুল যেন অশ্বের পা
আমার আর যাওয়া হোলো না ।

ধাতব লোহার বাঁধন মড় মড় ক'রে ভাঙে
সবুজ গাছের বরণ আরো সবুজাভা নিয়ে পাখীদের ডেকে আনে ।
হলুদ নদীর জল আজ যেন কিছুই মানে না
আমার আর যাওয়া হোলো না ।

কী যে হোলো, আমার শরীরে !
আগে থেকেই খুলে রেখেছি ঘড়ি আংটি যা ছিলো হাতে
বিসর্জনের বাজনা বাজলো রাতে ।
যৌবন, এই আমি তোর নদীতে ফেলে দিলাম দুশো খানা হাড়
নিত্য-পাগল, আমায় নিয়ে যা-খুশী কর্ এবার ।

আকাশটাকে খুলে দাও

নিঃশ্বাস নিতে পারছি না, আমার কষ্ট হচ্ছে
দরজা জানালা খুলে দিলেই হবেনা, আকাশটাকেই খুলে দাও !
আমি একা, গুটি কয়েক মানুষ আমরা বড্ড একা
যত সুন্দরই আমরা হইনা কেন
আমাদের সৌন্দর্য্যের বিভূতি যদি উদাস মাঠের মত পড়ে থাকে
আর শহরের যুবক-যুবতীরা টেলিভিশন আর সিনেমার পর্দায়

চুমু খেতে খেতে ঠোঁট সাদা করে ফেলে
তবে আর নিঃশ্বাস নেব কি করে !
নিঃশ্বাস নিতে পারছি না, আমার কষ্ট হচ্ছে
দরজা জানলা খুলে দিলেই হবেনা, আকাশটাকেই খুলে দাও।

আমার সোনার হরিণ চাই

কালিদাস মেঘকে দিয়ে অনেক কাজ করিয়েছেন
সে মেঘের রঙ ছিলো নীল ও ছাইছাই
আমি ওসব চাইনে
নীল মেঘের আকাশ আমি ভাসান দিয়েছি
গঙ্গাজলে মেঘ ভাসান, দুঃখ ভাসান, কান্না ভাসান ;
যে কোনদিন কাঁদেনি
তাঁর বুকে বেদুইনের পায়ের নিচের বালি ছাড়া অন্য কিছু থাকে না
টুসুর মত গানের ডিঙি বাইতে বাইতে কান্না আমি ভাসান দিয়েছি

এখন আমার চাইই চাই
বলতে পারো সাতটি ঘরের একটি দুলাল
এখন আমার চাইই চাই
হৃষ্টপুষ্ট কালো মেয়ের দেহের মত পুরুষ্টু এক মেঘ
সারা আকাশ, সারা আকাশ সোনার হরিণ দৌড়ে বেড়ায়
সিঁথির উপর দিয়ে

আমার সোনার হরিণ চাই।

পুতুল পোড়ে

কবিতার আসর থেকে বেরিয়ে আমি রাক্ষসের মতো বাতাস গিলেছি ;
জরু আর গরু, কান্না আর বেদনা বেশ সুখে আছিস !
ঝুপড়ি বানিয়েছিস ট্রেন লাইনের ধারে
একরঙা পুঁতির মালার মতো পর পর ট্রেন আসে, ঝিক ঝিক শব্দ
ওখানে ভিক্ষে করিস, খাস দাস, রাত এলে চোখে জল নিয়ে ডুবে যাস !
মাঝে মাঝে ভিক্ষের আঁচলে দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলে বলিস,
ভারতবর্ষ বিষবৃক্ষ, পাখী তুই বসিস না ডালে।

কবিতার আসর থেকে বেরিয়ে আমি বাসে ট্রামে
প্রতিটি মানুষের চোখ, মুখ, হাতের মুঠো
দেবীপ্রসাদের মত খুঁটিয়ে দেখেছি
হৃদয়ের হ্রদে ভায়লিনের পাশে আছে রবিশঙ্করের সেতার
গোপাল কাঁহারের মাদল

তাইতো শুধুমাত্র কান্নার উপমা দেখলে
আমি প্রতিটি কবিতার দূতাবাসে কুশপুতুল পোড়াই

পুতুল পোড়ে, আগুনের ছায়ায় কাঁপে ভারতবর্ষ।

ভালো আছো তো

আকাশ যেন কুটুম পাখী
এ পাড়া আর ওপাড়ায়
স্বপ্ন দেখায় :
কুটুম আসবে, কুটুম আসবে
চালের উপর দিয়ে পাখী গান গেয়ে যায় !

অনেকক্ষণ তো বসে আছি, বসতে বসতে পায়ের পাতায় রক্ত

শপথ তুমি কেমন আছো ? ভালো আছো তো ? বাড়ী আছো তো ?

জননীর ছায়া হ'য়ে থেকো

আমাদের মা নেই বৌদি
আরতি দেবার আগে ভগ্নস্তূপ প্রতিমার মতো
মাকে আমি হারিয়েছি সেই শৈশবে !
অন্ধকারে সূর্য্যের আলো কে দেখেছে কবে ?
তাই আমি মাকে আর দেখিনি কখনো।
আঁতুড়ের শয্যা থেকে উষাকালে শৈশবের সময় অবধি
সূয্যিমামার কাছ থেকে ছোটবোন মা আমার
আলো চেয়ে এনে
আমার দুর্বল দেহে ছড়াতেন বুঝি
তাই আমি বাঙলার পথে ঘাটে
সোনালী সবুজ মাঠে
সেই মাকে খুঁজি।
আমার যাত্রার শব্দে
অন্ধকার কেঁপে ওঠে
আমার আবেগে, ডাকে ঝড় তোলে আম জাম হেঁতালের বন
আমার উষ্ণতায় থরো থরো কেঁপে ওঠে জোয়ারের নদী।
জননী না হ'তে পারো, তুমি মোর
জননীর ছায়া হয়ে থেকো বৌদিদি।

ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষে কারাগার, হত্যা
কচি লাউ ডগা, বুনো নটে শাক যেন
প্রান্তর জুড়ে বেড়ে ওঠে বৃষ্টির আবেশে আর রাজকীয় স্নেহে !
অপরাহ্ন, পাখীদের আকাশে উড়িয়ে দিলে চলে যায় নিটোল সংসারে
রাত্রি নামে, ত্রিযামা রাত্রি ছ্যাখে রেডলাইট জেলে রেখে
কারা যেন স্বপ্নের চোখ খোঁজে
কারা যেন 'চোখ গেলো, চোখ গেল', কান্নায় হারিয়ে যায় !

তৎসম শব্দের মতন কঠিন শব্দ করে চলে যায় ভ্যানগুলি গ্রামের ভেতরে,
রক্ত ঝরে !
এ যেন বারোমাস্যা পঞ্জিকার অমাবস্যা, পূর্ণিমা, একাদশী
আসতেই হবে ঘুরে ফিরে ;

এই কি জীবন আমাদের ! খাণ্ডবদহন আজো বাঙলার খড়ের কুটিরে
ধূপকাঠি জেলে রেখে যতই সাজাও ঘর, তুমি শুধু পরবাসী শীর্ণা নদী তীরে

ষড়যন্ত্র সারারাত বঙ্গোপসাগরে
ঝিনুকেরা জানে, জানে মাছ, সমুদ্রের গাছ
নয়া উপনিবেশিক নিম্নচাপ ভীষণ সে জলে
আরো হত্যা আসিতেছে মৌসুমী বায়ু যেন দক্ষিণ সমুদ্র থেকে ।
তাই কলমে আঁচড় দিয়ে জানালাম তোমাদের, প্রস্তুত থেকো
কেননা আমাদের দেশে নেই অন্যকোন আবহাওয়া অফিস !

আক্রোশ

(পূর্ববাঙলার মেয়ে আমিনার নিমতা থানা লক-আপে ধর্ষিতা হওয়ার কথা মনে রেখে)

আমার ভাষা এখন খাড়া চুল, মাথায় কোন বেণী ঝুলবে না।

পূর্ববাঙলার মেয়ে এসেছিলো নদী পার হয়ে
শুধু এক নদী, ব্যবধান শুধু এক নদী

নদী পার হতে হতে বৃষ্টি নেমেছিলো ঃ
যার ঘর নেই, ভিটে নেই, স্বামী নেই
বৃষ্টি তাকে ডাকবেই ।

বাল্মিকীর তপোবন রামায়ণে লেখা আছে
সেখানে বাল্মিকী থাকেন, ছাত্ররা থাকেন, যুবতী সীতার শরীর
অন্ধকারে শুয়ে থাকে, প্রহরী আকাশ
মেঘের আঁচল বেয়ে ভিন্ন এক বৃষ্টি নামে !

বৃহত্তম ভারতীয় গণতন্ত্রে আমাদেরও তপোবন আছে
রাজা, মন্ত্রী, কোবিদ-তপস্বী সবাই থাকেন দূরত্বে, রাজধানীতে
থানকুনি পাতার মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তপোবনে প্রহরী পুলিশ ;
এখানে প্রতিরাতে আকাশে মেঘ জমে
বলয় শুদ্ধ চাঁদ কোথায় ফেরারী !
পুববাঙলার মেয়ে নদী পার হয়ে, বৃষ্টি ভেজা শাড়ী পরে
এসেছিলো এই তপোবনে
শাড়ী শুকলোনা, চোখ বোজা ছিলো
চোখের মণি ছাড়া দেহের সমস্ত কোষে পুলিশের আমিষ গন্ধ !

যে দেশে ফিউজ তার দিয়ে বারবার কবির হৃদয় জ্বালাতে হয়
সেই দেশে তুই মর, মর আভাগীর বেটি
বিবসনা, বেঁচে থাকিস না !

আঁকতেই হবে আল্পনা

এখন আবহাওয়া ভালো নেই, অনেকেই কথা রাখছে না
ম্যাপ আঁকতে দিয়েছিলাম ওকে, আঁকেনি ;
হয়তো প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন মিটে গেছে
এমনও হতে পারে, ইচ্ছেগুলো যে যার মেজাজ নিয়ে
চারিদিকে ঘুরছে ফিরছে

এখন আবহাওয়া ভালো নেই
দর্জিকে যে মাপ দিই, সেই মাপে একটাও জামা পাই না।

কিন্তু এই যে ভারতের ম্যাপ, তোমাকে যে আঁকতেই হবে আল্পনা।

আয়ারল্যাণ্ড :

দোলনচাঁপা মাটি তুলে উঠছে, না, চাইছে না, কিছুতেই চাইছে না
তোমরা কোলের ছেলেকে মাটি চাপা দেবে
আর জননী মাটি পাশে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করবে
না, চাইছে না, কিছুতেই চাইছে না।

কোকিলের কণ্ঠস্বর বাদ দিলে কি থাকে—
এক জোড়া ঠোঁট, চোখ, কিছু মিশমিশে কালো পালক
কিন্তু গান ? গান বাদ দিয়ে কোকিল
আর ববি, হিউজেস, ম্যাকারিও তোমাদের বাদ দিয়ে আয়ারল্যাণ্ড !
অসম্ভব !

দোলনচাঁপা মাটি তুলে উঠছে, না, চাইছে না, কিছুতেই চাইছে না
তোমরা কোলের ছেলেকে মাটি চাপা দেবে
আর জননী মাটি পাশে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করবে
না, চাইছে না, কিছুতেই চাইছে না।

যার জন্যে ঘরে ফেরা

রাত হয়ে গেছে, বাড়ী যাই :
তিরিশ বছর ধরে এইতো কোলকাতা,
পাখীর মুখের কথা।
ভিখিরী আর কুকুর ছাড়া সবাই বাড়ী ফিরে গেছে
তবু কেন কুলুঙ্গীতে ভিক্ষার থলি, দেয়ালে নখের আঁচড় ! !

যার জন্য বাড়ী ফেরা—যার মুখ
সেও তো ঘরে নেই !

জিজ্ঞেস কোরোনা কেন

মানুষ জাগেনা যখন
অন্ধকারে কেঁদে ওঠে নীলকণ্ঠ চাঁদ
আমি নদী পার হই
করতলে তুলে নিই তৃষ্ণার জল, পান করিনা
জিজ্ঞেস কোরোনা কেন

মানুষ জাগেনা যখন
কার যেন চোখ থেকে নেমে আসে বুকভরা জল
আমি পাহাড় ডিঙোই
হাতের মুঠোয় তুলে নিই আমার পিতার ঠোক্‌রানো চোখ
জিজ্ঞেস কোরোনা কেন

সংবাদেও খুন হতে পারি

সংবাদেও খুন হতে পারি !
এখন মহিম ওয়েন্ডার বা আমার চোখের মধ্যে ধূপের কাঠি খুঁজোনা:
এ সময়ে ধূপের গন্ধে পেটের শেষ দানাটুকু উঠে আসে ।

বারোমাস্যা মিছিলের রোদ বুকে নিয়ে ঘরে ফিরে দেখি
চুলের মতই চোখ সাদা হয়ে গেছে ঃ
সংবাদপত্রে লেখা, নুরুলের মা এখন ভিখারী !

আমার বিছানায় আমি খুন হতে পারি !

কলকাতাকে লাথি মারিসনা

হেইরে, কত বাড়ী কইলকাত্তায়, তাই না
হেইরে, কত গাড়ী কইলকাত্তায়, তাই না
রমজানের মা !

শরীর ফুঁটিফাটা কোরে যে ছেলেকে বিয়োলি
তার মরদেহ কোলে করে তুই কোলকাতাকে লাথি মারিসনা

কোলকাতা আমাদের ভিক্ষে দেয়।

হেঁটে যাব দক্ষিণ সমুদ্রে

পারছিনা, নদীর ঢেউয়ের মতো উদ্দাম অপরূপ
হতেই পারছিনা
যখনই সুযোগ পাই জোয়ারের নদীদের কাছে গিয়ে
নিজের চেহারা মিলিয়ে নিই

কি ভীষণ সুকুমার স্থবিরত্ব শেওলার মত শুয়ে আছে "মঙ্গলার" জলে !

একি ময়াল সাপের বাঁধনে বন্দী "মঙ্গলার" জল
নাকি আমারই অচল ছায়ায় ডুবে গেছে ঢেউ !
ডাক্তার, একি নদীর অসুখ, না আমারই দীর্ঘ শুয়ে থাকা বলে যান
সিষ্টার, এ আমার অন্তরঙ্গ চিৎকার, আমাকে বাঁচান
আমারই অসুখ যদি, জীবন থেকে শেওলা সরিয়ে নিন
হোক অপারেশন, একটি নদীর জল লাল…
আমি দু'পায়ে জড়িয়ে নদী হেঁটে যাব দক্ষিণ সমুদ্রে।

কালো কোঁচকানো চোখের গান

কোথায় যাচ্ছেন দাদা হাঁটতে হাঁটতে
অনেক তো হাঁটলেন, এখন একটু থামুন।
কোথায় যাচ্ছেন দাদা ভাবতে ভাবতে, না ভাসতে ভাসতে
অনেক তো ভাসলেন, এখন একটু থামুন।

ঝাঁটা আছে ঝাঁটা, নিজের ঘরটাকে একটু পরিষ্কার করুন না!
বাম্বের মাথার উপর একরাশ কালি
কোন যামিনী রায়কে দিয়ে ঘরটাকে পোটোপাড়ায়
মাটির সরা বানাতে বলছি না
অন্ততঃ কালিঝুলিগুলোকে বিদেয় করুন!

পৃথিবীতে রোদের বয়স অনেক হোল
কই, কোনদিন তো দেখলাম না,
আমাদের কালো কোঁচকানো চোখে রোদের হাঁটা চলা!

আপনি তো অনেক হেঁটেছেন
এবার রোদকে একটু হাঁটান না, হাঁটান।

কবিতা

আমাকে স্বপ্নে ভয় দেখিওনা আহাম্মক
আমি ডুবতে ডুবতে নদীর তলানি ছুঁয়েছি
মৃত্যু আমার দোসর হবেনা বলেছিলো
এখন মৃত্যুকে দিয়ে বাসর সাজিয়েছি।

কে যেন যাচ্ছে পাতালে

(দেবু ও চন্দনাকে)

মাঝে মাঝে পাতাল থেকে জল টেনে তুলতে হয়
সেই জলে স্নান সেরে   তবে শান্তি

মানুষের অপমানে কবিতার অঙ্গ জ্বলে
এই দুর্ভাগা দেশে
পাতাল থেকে জল টেনে তুলে কবিতার অঙ্গ ধোয়াবে কে
কে যেন যাচ্ছে পাতালে
কে

মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়

গানের পাখি চোখে পড়লেই ঘাড় ফেরাতে হয়
সে তুমি যে পথ দিয়েই হাঁটোনা কেন
মনের ভেতর কোন তারে কি যেন একটু বাজিয়ে দেয়

আমাদের মিটিংগুলো, ঐক্যের মিটিংই বলো আর সংগ্রামের
মিটিংই বলো—
আমার মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়, ওকেই সভাপতি করি
সামান্য কালো বেড়ালের থাবায় সভা যখন ভাঙ্গো-ভাঙ্গো
তখন একঝাঁক গানের পাখি উড়িয়ে দিই—
সভার মাঝখানে।

হোক না সামান্য মাথাঠোকাঠুকি
তারপর সবাই তো একদিকেই ঘাড় ফেরাবো।

তোরা কৃষ্ণে নিয়ে ঘুমো

মাঝরাতে প্রত্যহ ঘুম ভেঙ্গে যায়

কি এসে যায় তাতে, তোরা ঘুমো !

দূরে কোথাও ট্রেন যাচ্ছে, আকাশে কেউ জাল ফেলছে
চাঁদের চাঁদোয়া খুলে ইষ্টিশনে কেউ খাচ্ছে চুমো
এমন রাতে,
আমি মেঘ হতে যাই মধ্য যামিনীতে।
ইষ্টিশনে জেগে আছেন মা,
বৃষ্টি নামে না, তাই
তোরা কৃষ্ণে নিয়ে ঘুমো,
আমি বৃষ্টি হ'তে যাই।

মা আমার নিজেই সেজেছে

পশ্চিমঘাট পর্বত যেখানে মুকুট খুলেছে মাথা থেকে
সেই সমতলের নদীর ধারে ছিলো আমাদের ঘর
আমাদের ঝুপড়িগুলো ছিলো শীতের দোলনা, সবিতার রথের চাকা !
কেঁদু, ইউকেলিপ্‌টাস আর সেগুনের জঙ্গল ছিলো আমাদের আঁতুড় ঘর
সেখানে গোপনে নিশ্বাস নিতে যেতাম !
পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্গন্ধ শবরীর পেট, শবরীরা আমাদের মা
পিপাসার ক্রীড়াঙ্গণে প্রবেশ নিষেধ !
লোহার খনি থেকে বয়ে আসা লালজল ছিলো আমাদের পানীয় ;
পৃথিবীতে রাত যে কত মধুর তা বোধহয় আমরাই জানি
অন্ধকার নেমে এলেই বেপরোয়া, জলের জন্যে মরতে পারি।
(আহারে রূপসী তুই শতরূপা আমার পিপাসা !)

হঠাৎই আমার মা মারা গেলেন
কেউ বলে পাপিষ্ঠারে নিয়েছে নর্মদা
কেউ বলে ঠিকাদারের ঘরে মদে বেহুঁশ হতেই
কারা যেন এতদিনের ঘেন্নার শরীর ধরে নেচেছিলো খুব !
আমাদের গাঁয়ের নদীটা যেমন বালির কাঁথা গায়ে দিয়ে শীতের সকালে
কুঁকড়ে পড়ে থাকে
আমার মায়ের দেহটা অমনি পড়েছিলো !
বালির ভেতর থেকে তুলে এনে মাকে পুড়িয়েছি
এই প্রথম মাকে আমি সাজতে দেখলাম,
পা দুখানি আলতায় রাঙা !
পড়শীরা বলেছিলো, রক্ত
আমি বলেছি, না, রক্ত নয়, আলতার রঙ !
আমি তো মাকে কোনদিন সাজাতে পারিনি

মা আমার নিজেই সেজেছে !

ঝড়ের জন্যে গান

ছিন্নভিন্ন করে দাও কাল্পনিক ঝড়ের আকাশ ;
দেখুন বাবুরা, ঝড় নিয়ে অযথা টানাহাঁচড়া করবেন না
আপনি ভালো বক্তৃতা দেন, দিন
আপনি ভালো পার্টিক্লাশ নেন, নিন
আপনি ভালো ছবি আঁকেন, আঁকুন
আপনি ভালো কবিতা লেখেন, লিখুন
কিন্তু ঝড় নিয়ে মাতলামো করবেন না, একদম না
এ পাড়ায় না, ও পাড়ায় না

আমরা আকাশকে চিনি, নীল
আমরা বাতাসকে জানি, পরশ লাগে
আমরা নদীকে দেখি, বয়ে যায়
আমরা ঝর্ণাকে জানি, গান গায়।
আমরা কেউ রাতকে দেখিনি
আমরা কেউ ঝড়কে দেখিনি !

বৃক্ষের উপরে বসে হে দেবতা, যতই অভিজ্ঞান দাওনা বিছিয়ে
ও জঞ্জাল স্পর্শ করিনি।

মুন্সিপাড়ার দাওয়ায় কুরুলিয়ার পুরনো কই ভাজার জন্য
বসে থাকুন আলমামুদ
বাস্তারের হাঙ্গোয়া গাঁয়ে, দুর্গের পাথুরে খনিতে
বুকের নদীতে কেউ পোনা ছড়িয়েছে
তারই একটি দুটি বৃক্ষ হবে, রাত হবে, ঝড় হবে, ভেঙ্গে পড়বে।
আমরা কেউ রাতকে দেখিনি
আমরা কেউ ঝড়কে দেখিনি।
পৃথিবীর পিঠের উপর কেমন করে কালো চুল ভেঙ্গে পড়ে
দেখবো বলে, দীর্ঘতম পিপাসা নিয়ে
পশ্চিমঘাট পর্বতের চূড়ায় পাথর মাড়াচ্ছি পাখীদের দলে ভিড়ে গিয়ে ;
ঝড় এলে আমি তাপসী অপর্ণা হবো, পাখী হবো।

আমরা কেউ রাতকে দেখিনি
আমরা কেউ ঝড়কে দেখিনি।

তবুও কাফ্‌কার* মতো বলতে পারিনি

কাকের ডাক
ওর যত ডাক, যতবার ডাক, সবই তো ক্ষুধার জন্য !
আচ্ছা, ওদের কি কঠিন আমের ডালে বসে গাছটাকে
একবারও ঠোক্‌রাতে ইচ্ছা করেনা !
আমার কখনো মনে হয়নি, পেটের আগুন ছাড়া
অন্যকোন পৃথিবী ওদের আছে ।
ওরা তো মানুষের সবচেয়ে কাছাকাছি থাকে
তবে কেন পেটের আগুন ছাড়া অন্য কোন আগুন দেখেনা
ভিখিরির পোষাক ছাড়া অন্য কোন পোষাক পরে না ?
পতঙ্গ পুড়ে যায়, কাক তো পোড়ে না !

পৃথিবীর তিনভাগ জলের মতই আমাদের ক্ষুধা পারাবার
তবু কাফ্‌কার মতো বলতে পারিনা
মানুষ তুই কাক হ'য়ে যা ।

আজ রাতে আদিম হয়েছি

হাসির পরাগ মেখে যারা এসেছিলো তারা চলে গেছে
বাতাসের তাড়া খেয়ে দুটি কি তিনটি পাতা
জানলা খুলে দেয়ালের গায়ে লেগে !
আমার প্রিয়ার মুখে ছায়া পাশবিক
চোখ লাল !
মেঘেরা আমারই নারীর বুকে
এ লজ্জা কোথায় রাখি । হাত ভরে গেছে ।

কাফ্‌কার : বিখ্যাত গল্প Metamorphosis-এর লেখক ।

দাঁত-ভেঙে যায় যাক, মেঘ তোর বুকে আমি কামড় বসালাম·

সভ্যতা, ক্ষমা কোরো
আমি আজ রাতে আদিম হয়েছি।

বসন্ত ভাড়াটে নাকি বুকপকেটে

গাছের পাতা, শূন্যমাঠের খড়, নদীর জল, নদীর মাটি
হাতের রক্তে, বসতবাটি
এমনকি বাতাসবন্ধুকে নিয়ে ঘর বানায় মানুষ
রাস্তায় ;
যারা যারা এইসব ঘরে থাকে
খবরের কাগজে কালো অক্ষরে
তারা কেউ কেউ মানুষ, অনেকেই ইতর !
ইতরেরা সংখ্যায় বেশি বলে খবরের কাগজেরা
মাষ্টারমশাই।
সম্পাদক, আহা 'সুবোধ বালক' ভাবে
বাঙলাদেশ সুবোধ যাদবের দেশ
তাই ইবলিশের বাচ্চাদের মানুষের পোষাক পরিয়ে
লেখা হয় : ইবলিশের বাচ্চারা সুবোধ বালক
তারা ঘোড়ার মাংস খায় না
সুতরাং নিরামিষাসী পুলিশ, আমলা ইত্যাদি ইত্যাদি···
চাঁদমারীর মাঠে রক্ত আসলে অহল্যা আর অনুসূয়ার সিঁদুর খেলা !

আর ইবলিশের বাচ্চারা মাইনে পাক আর না পাক
বুকপকেটে টাকা জমে জমে পাথর
পাথরে আতর···
ট্রালা লালা, ধেরে কেটে
বসন্ত ভাড়াটে নাকি বুকপকেটে !

ভয় পাসনে মেয়ে

ঘোমটা পরা মায়ের কথায়
এই এসেছি আলের ধারে ।
ডাকাত বিলে আঁধার নামে
স্বর্ণছড়া কারাগারে !

চাঁদের ফালি রূপশালি ধান
বাঘের ছেলে চাটে !
ভয় পাসনে   ধান
ভয় পাসনে   মেয়ে
নদীর মোহনা
ঘোমটা পরেনা
আকাশে মেঘ সাজিয়ে রেখে
আসছে আমার মা !

সূর্য্য তুমি কি সুখী

এর আগে কেউ তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলো কিনা জানিনা
এর পরেও কেউ তোমাকে জিজ্ঞেস করবে কিনা জানিনা,
সূর্য্য, তুমি কি সুখী ?

দীপকের হাত বেয়ে নেমে আসে আশ্চর্য সেতার,
সে তো প্রাত্যহিত ঝঙ্কার !
তবু কেন নিশি যাওয়া আসা ?
ভালোবাসা
নদীর গভীরে গভীর
নেই কোন আলো
মাটির গভীরে গভীর
নেই কোন আলো !

মালিনী চলেছে পথে
ফুল নেই হাতে
দীর্ঘ চাঁদ লজ্জা খুলে দিলে
একথালা ভাত পাবে রাতে
পোড়ামুখী !

সূর্য্য, তুমি কি সুখী !

আমার একটা চাবুক দরকার

কাকে মারবো জানিনা
স্থির করিনি
তবে মারবো।
আমার একটা চাবুক দরকার !

নদীর জলে চলকে ওঠা মাছেদের চেয়ে ভিন্ন স্বভাবে
কে যেন আমাকে ঝাঁপিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে !
স্থির থাকতে পারছিনা !

গাছের পতাকা, পাতার মর্মর, বাতাসের কলস্বর,
কোলকাতা শহর
ঘুঙুর গুঁড়িয়ে ছড়িয়ে দিয়েছি সবার মাঝখানে
বার বার ;
তবু কেন চোখের জোয়ালে বাঁধা অস্থির পাহাড় !

কোন কিছু আমাকে টানে না।

আমার একটা চাবুক দরকার।

আয় বোন খুকুমণি

জীবনে যন্ত্রণা আছে
আছে কিছু কাব্য
সংশয় দোলনা
সে তো ভবিতব্য !

খুকুমণি বোন আমার
শ্রমিকের ঘরণী
কালো কালো রদ্দুরে
কি ভীষণ সরণী
পার হয়ে যাও তুমি
দাঁত চুঁয়ে রক্ত
মৃত্যুকে বুক দিয়ে
আগলাতে মত্ত।

শোন বোন খুকুমণি
ভাই আমি বাঙ্‌লার
অনেক দেখেছি ক্ষুধা
যন্ত্রণা, কারাগার।

অনেক সয়েছি রাত্রি
চাঁদহীন নরকে
অনেক দেখেছি মৃত্যু
বাঙ্‌লার মরকে।

আয় বোন খুকুমণি
আমি তুমি দুইজন
নরকে মশাল জ্বালি
আমরণ আমরণ ॥

—৪

সূর্য, তোর একি সাজ

(তথাকথিত এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধেয় গণসঙ্গীতকার হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গান মাঝ পথে বন্ধ করে দেবার প্রতিবাদে)

চাঁদের বিধবা সাজ দেখেছি অনেক
আকাশকে দেখেছি কাঁদতে মাঠ ঘাট দুহাতে জড়িয়ে
কিন্তু সূর্য, তোর একি সাজ !
তুই তো গানের দেবতা—
তবে কেন হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গান মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায় !

মাঠ-ঘাট গাছপালা কুটুম কোকিল মালা
কত সুর বেলফুল গাছের চারায়
তবে কেন হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গান মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায় !

সূর্য, তোর একি সাজ !
নাকি তুই শুধুই প্রকৃতি !

এই তো সেদিনও

এই তো সেদিনও শপথ ছিল
প্রজন্ম ছিল ব্যস্ত
চোখে ছিল গাছ
পাখী এসে গাছে বসতো !
কত যে পাখীর সুরে সুরে ঢেউ
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভাঙে রাত্রির প্রতি কণা
কত যে শেকড় চোখের গভীরে
দুহাতে দিয়েছে আল্পনা !
তারপর
তুই যাবি, না আমি যাব
আমি যাব, না তুই যাবি—
দুইজনে মিলে ঝর্ণা ।

এই তো সেদিনও শপথ ছিল
মোহনায় যাবে
নদী তার চোখ খুলেছিল
নদী তার রূপ খুলেছিল !

গ্যালিলিওর বংশধর

(শংকর গুহ নিয়োগী ও সহদেব সাহুকে নিবেদিত)

পতঙ্গের চেয়ে আমি খুব একটা বেশী বুদ্ধিমান নই
আগুন জড়িয়েছি গায়ে
মাথার দুর্লঙ্ঘ্য অংশে পরীক্ষা করে দেখতে পারো
ড্রিলিং, ব্লাস্টিং, ধোঁয়ার কুণ্ডলী, খনিজ ধ্বস্, আগুন, তারপরেও আগুন !
পুড়ে বেঁচে থাকা পতঙ্গের স্বভাব নয়, আর এখানেই আমার জিত্।

তবু একদিন পুড়ে যেতে হবে !

গ্যালিলিওর বংশধর যখন
সূর্যের ভেতরটা ঘোরাফেরা প্রয়োজন আমার ;
আমার স্বপ্ন আর দুটি চোখকে আমি একই মঞ্চে নিয়ে এসেছি
জ্বলন্ত সূর্যে চলে যাচ্ছি।

নদীতে এখন শীত লেগে আছে
পৃথিবীর গায়ে জামা নেই, ন্যাংটা মেয়েটার গায়ে শীত
ভীষণ শীত লেগে আছে !
নিস্তরঙ্গ মেয়ে, এ বছর কোন পাখীর ডাক শুনেছো কি তুমি ?
সব উড়ে গেছে। গাছেরা লাউডগা হয়ে শুয়ে আছে ভুঁয়ে !
কে দেবে প্রার্থিত ওম, কে ছড়াবে শিমুলের গুটি !
ইস্পাতের পাত থাদান শ্রমিক নেতার মত দাঁতে মুখে শীত ছিঁড়ে ছিঁড়ে
সূর্যের ভেতরটা ঘোরাফেরা প্রয়োজন আমার !

দেখতে শুধু পান না

কবির আছে সহজ হৃদয়
নরমঝাঁপে নিচ্ছে তুলে
হাতের কাছে যা কিছু পায় !

পাহাড় ঘেরা সবুজবীথি শীতের রাতে রাত পোহায় !

পদ্য লিখে বাজার খরচ
এবং এবং নজরবন্দী !
হাত দিয়ে নয়, মাথা দিয়ে
রাষ্ট্রকে দেন খাজনা !
রাতের গায়ে রাত লেগেছে
দেখতে শুধু পাননা—

একা এবং অবিশ্রান্ত নিজের মায়ের কান্না !

যে মানুষটি

(বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবন ও কবিতা মনে রেখে)

যে মানুষটি কবিতার অপমানে দুঃখ পান
মানুষের অপমানে অস্থির,
তিনি এখন অস্থিরতা বুকে নিয়ে স্থির বসে আছেন !
তবু তাঁর কবিতার অক্ষরগুলো ঠিকানা চায়—
এই কালবেলায় যারা বেঁচে থাকার কথা বলে
নিবু নিবু আগুনকে জ্বালিয়ে রাখে !

আমি চাই

কবে যে আকাশ থেকে মুষ্টিভিক্ষা পড়েছিল,
রঙিন বৃষ্টি—
পাখীর পালকে, ফড়িংয়ের চোখে, ফুলের শরীরে·
তবু আজ মনে হয়
সব রঙ আকাশ আমাকে দেয়নি,
অসংখ্য রঙিন লুকিয়ে রেখেছে সে !

যাকে তুমি ভালোবাসো
সে যদি একই হাসি রোজ হাসে, একই রঙে
তোমার কি ভালো লাগে ?
কাঁঠাল পাতায় শিশিরের রঙ কি শুধুই জল !
যখন সে পড়েছিলো কারো চোখ থেকে
তখন সে কেমন বেদনা-রঙিন ছিল ?

মানুষকে যে রঙে দেখছি
অন্য কোন রঙ আছে
অন্য কোথাও, অন্য কোথাও !

আমি চাই পৃথিবীতে নতুন রঙিন
নতুন বৃষ্টি ভিজে হেঁটে যাবে নতুন মানুষ ।

সূর্য আর মজনু সা জানে

সমুদ্রে হারিয়ে গেছে কেউ কেউ
এখনো নৌকোর পাটাতন ভাসে !
তোমরা কেউ পাটাতন দেখনি
ওখানে সূর্য আসে, সূর্য কাঁদে
বেলা বেড়ে গেলে টুপটুপ রক্ত ঝরে !
শহীদবেদীর মত সমুদ্রে পাটাতন ভাসে

সমুদ্রে হারিয়ে গেছে কেউ কেউ
এখনো নৌকোর পাটাতন ভাসে
কে ভাসালো, কে হারালো !

আমি নই, তুমি নও
ডিরোজিও তুমি নও
সূর্য আর মজনু সা জানে।

কবি সম্মেলন

এসো, অরণ্যে প্রবেশ করি
বাঁকা চাঁদ নুয়ে আছে, শুয়ে আছে
ফাঁসি বুঝি হয়ে গেছে কাল !
এসো নীল নীল ছায়ায় প্রবেশ করি ;
নীল নীল ছায়ায় আছে গোসবা বা আমঝোরা গাঁয়ের বধুয়া-
একদিন মাচা বেয়ে উঠেছিল লাউডগ, পুকুরে কলমিলতা,
কারো নাম হয়তো বা ছিল মমতা !
ডিঙি বেয়ে, গান গেয়ে, কেউ বুঝি এনেছিল
পোয়াতি বৌয়ের জন্য রাঙা মাছ, রাঙা মুড়া ঃ
এখন অরণ্যে অরণ্যে শুধু সাপিনীর ঘাম, সাপিনীর কাম
বাঘের মুখের ভেতর মরেছে জ্যোৎস্না !

এসো, অরণ্যে প্রবেশ করি
এখানে বা ওখানে নিশ্চয় ফুটেছে জবা
অস্থির করেছে বন,
এখানেই কবি সম্মেলন !

সে কি কবিতা লিখতে পারে

পালঙ্কে বসে আছে শঙ্খ বা কবিতা তোমার।

আমি আজকেই হৈ-হৈ রটিয়ে দেবো—
যে যেখানে আছো ধুতুরার ফল খুঁজে আনো,
কবিতায় বিষ ঢেলে দাও!

এই তো সেদিন বনগাঁয় ঝড় হয়ে গেল
কত গ্রাম কাত হয়ে পড়ে আছে আজো ;
কই, তোমার পালঙ্ক তো একটুকু বাতাস ছুঁলো না!

শরীরে বিষ নেই
সে কি কবিতা লিখতে পারে ?

মাছ নিয়ে যায় ফৌজদারে

কটি মাছ ধরলে রসিদ ভাই
কটি মাছ পড়লো তোমার জালে
নীল খয়রা, ট্যাংরা পুঁটি
কয়টি ফলি চুপটি চুমু দিল তোমার গালে ?

গুমর নদীর গুমর ভাঙ্গে না
রসিদ মিঞা জলকে ছাড়ে না

নদীর জলে পাশাবতীর প্রাসাদ ভেঙ্গে পড়ে
জনম গেলো, মরণ গেলো, রসিদ মিঞা জল ছাড়েনি ঝড়ে !
জল ভাঙ্গে, না কমলালতা   বুঝতে পারিনা
মাছ নিয়ে যায় ফৌজদারে   বিচার হবে না ?

চণ্ডাল চণ্ডিদাস আর কত রাত পোহাবে

আমি ভারতবর্ষের নিঃশ্বাস নিয়েছি দু হাতে—
নিঃশ্বাসে কোন আমের বোলের গন্ধ নেই !
যতই না ফুল ফুটুক বসন্তে
আমি কোন কুসুমের গন্ধ পাইনি ;
আমার অঞ্জলি ভরা রাত্রি
রাত্রির পল্লবে জোনাকির মৃতদেহ
কালজানি নদীর জলে একাই ভাসছে বেহুলার ভেলা

চামড়া পুড়ছে, পলাশফুলের চামড়া—
ভারতবর্ষ তোমার মাটি, তোমার আকাশের জীবন !

আমি এই হাত নিয়ে কোথায় দাঁড়াবো ?
আমার হাত কাঁপছে
এ হাত কোথায় রাখবো ?
এতো হাত ভরা রাত ভরা দীর্ঘশ্বাস
কোন নদী বয়ে নিয়ে যাবে !
চণ্ডাল চণ্ডিদাস আর কত রাত পোহাবে !

যে চোখ কাউকে খাজনা দেয় না

আমার খোঁজ না পেলে
আমার চিঠি পেতে দেরি হলে
পাথর চিবিয়ে যে মেয়েটি বড় হয়েছে
সেও থরো থরো কাঁপে !
উৎকণ্ঠার তুষার তাকে ভিজিয়ে দেয়

আমি যখন ঝোড়ো পাখীর গান শোনার জন্য
প্রতিদিন ঘর থেকে বেরিয়ে যাই
তরবারির মত আমার চোখ !

কোন নির্জন নগ্ন নদীর পারে
বা শহরের ট্রামঠাসা পথে
খুনী দাঁড়িয়ে থাকবেই
আর তরবারির মত আমার চোখ !

আমার ছোট্ট দুটি চোখ
বাংলাদেশের নটে গাছটিকেও মুড়োতে দেবে না বলে…

তুমি কি আমার চোখ দুটি ভালো করে দেখনি প্রিয় ?
তরবারির মত আমার চোখ
যে চোখ কাউকে খাজনা দেয় না ।

ব্যাকরণ বনাম ব্যাকরণের ছড়া

ভোট হোলো তো, বেশ হোলো
কেমন আছো দাদা ?
চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে
একটা বিড়ি দাওনা রাধা !

মাথাঠাথা খারাপ নাকি—
লিঙ্গ পড়োনি ?
ব্যাকরণের পাতায় দেখো
জনক কি হয় জননী !

খুনীর দোষে খুন হয়েছে খুনী
তাতেই যদি দেশ ভেসে যায় ভক্তিরসের প্লাবনে
জীবন ব্যাকরণের পাতা উল্টে রেখে
কাজ কি বলো শুদ্ধ ব্যাকরণে !

একটা বিড়ি দাওনা কানে !

বাতাস তুমি

আমার স্কুলের ছাত্ররা নানারকম খেলা তৈরী করে, খেলে,
পড়াবার মাঝে ধমক দিতে দিতে আমি ওদের খেলা দেখি, মজা পাই !
ওদের নানান খেলা, এ ওর জামার খুঁট ধরে টানে
ও এর ঘাড়ে হাত বুলোবার ছলে চিমটি কেটে দেয় !

সবচেয়ে যে খেলাটা ওরা বেশী খেলে, পারদর্শীও বটে,
এর স্কেল ওর কম্পাসবাক্সে ঢুকে যায়
ওর পেন এর বইয়ের নীচে হামাগুড়ি খায়,
এই মজার খেলা, পাল্টাপাল্টি খেলা আমি রোজ দেখি !

স্কুলের বাইরে, রাস্তায়, কলকারখানায়, চাষের মাঠে আরো এক বড় খেলা হয়,
এখানে বড় মানুষেরা ঝাণ্ডা বদল করে—
লাল নীলের কাছে যায়, নীল লালের কাছে ;
ঘুরে ফিরে লাল নীল, নীল লাল, নীল লাল, লাল নীল,
শকুনীর চাল !
আমি বিষণ্ণ হই,
মানুষের রক্তের দাম এইভাবে কমে যাচ্ছে বলে
আমি ক্রুদ্ধ হই ।

গ্রামে গঞ্জে, কোলকাতার রাস্তায় অনেক ঘুরেও
আমি কোন ভিখারিকে ভিক্ষাপাত্র পাল্টাতে দেখিনি
বরং কেউ পাল্টাতে এলে ওদের মাথায় খুন চাপে !
অথচ বড় মানুষেরা কত সহজেই না রক্তের অপমান করে—
রক্তের অপমান ! বিজ্ঞানের অপমান !
কোপার্নিকাসকে যারা পুড়িয়েছে, গ্যালিলিওকে যারা পাহারা দিত
তারা কি সূর্যকে ঘোরাতে পেরেছে ? টলাতে ?
ধর্ম, রাজার মুকুট, শকুনীর মাথা কি বারবার মানুষের পায়ের তলায়
পড়ে যায়নি ?

ঐ সময়টুকু হাতছাড়া কোরোনা ;
চোখের পাতা মাটির সঙ্গে গোবরের মত লেগে থাকুক,
কোন তাড়াহুড়ো নয়
সন্তর্পণে দুটি পা ধর্মে, রাজার মুকুটে, শকুনীর মাথায় !

বাতাস তুমি মানুষের চোখের পাতা নাড়িও না ।

রঙের ভিকিরি

কলকাতার রাস্তায় খড়ি মাটি নিয়ে ছবি এঁকে
প্রার্থনার ঢং-এ বসে আছেন রঙের ভিকিরি !
শব্দ নয়, যশ নয়, চোখের মণি—ভাত !
সাঁজের বাতাসে কোন বৃক্ষের নীচে ঘুমিয়ে পড়া !

শিল্পী ঘুমিয়ে আছেন
ঘুমিয়ে আছেন রাস্তায়—
গন্ধ-গন্ধা পৃথিবীর বুকে এ যে
ঝর্ণার হেঁটে যাওয়া ঘুম !
ভোর হলে শুরু হবে রঙের ভিক্ষা !

ভোর, আর কতদিন অপমানে কাঁপবে তুমি ?

সেজাম্মেল নিয়ামৎ

মেঘ জল দিয়েছে
লাঙ্গল পড়েছে মাঠে
ঘরে অজন্মা হাসি
পথে গন্ধফুল নিঃশেষিত
নাকাড়া বাজায় অসুখ !
গাঁয়ের ছেলে সেজাম্মেল আজন্ম এই পথে হাঁটে
গাঁয়ের মানুষ নিয়ামৎ আজন্ম এই পথে হাঁটে
এবার হৃদয়ের ভেতরে হাঁটা ;
নদী বহে চলে অসুস্থ নদী
গ্রাম বহে চলে অসুস্থ গ্রাম
সেজাম্মেল নিয়ামৎ ডাবের পানি আর ওষুধ নিয়ে
নদী থেকে নদী, গ্রাম থেকে গ্রামে !
চলার পথে দিন ওদের সাথে রাত ওদের সাথে
পড়শী গাঁয়ের বিছানার পাশে ডাবের পানি আর ওষুধ রেখে
বাড়ী ফিরছে সেজাম্মেল
বাড়ী ফিরছে নিয়ামৎ ;
চাঁদের কলঙ্ক শুধু আকাশেই নয়
তার আলোর ভেতরে—
মাঠভরা আলোর রোশনাই
তুঁতে পাতার ঝোপে অন্ধকার
আর পৃথিবীর নর্দমায় চান-করা চোরেরা ওখানেই লুকিয়ে থাকে
পৃথিবী নামক গ্রহটি নিজেকে ঘোরাতে ঘোরাতে
নিজের প্রতিটি পাঁজর কড় কড় গুণে নিতে নিতে
সৌর আকাশ দেখে
নেপচুন জুপিটার কার পাশ দিয়ে উড়ে আসে
উল্কা নামে পাখী
তরবারির মতো পৃথিবীর চোখ !

সেজাম্মেল নিয়ামৎ মানুষের হৃদয়ের ভুগোল পড়েছে
পৃথিবীর ভুগোল পড়ে নি
চাঁদের কলঙ্কের পাশে তরবারির মতো চোখে ঝল্‌সে ওঠে নি
তাই, হেঁসো আর বল্লমে গাঁথা হলো গ্রামের শিল্পী!
অজন্তার ছবির মতো যাদের হৃদয়
ইলোরার পাথরের মতো যাদের শরীর!
আমি অজন্তা দেখেছি, ইলোরা দেখেছি,
ওদের নিয়ে কবিতা লিখি নি
সেজাম্মেল নিয়ামৎ আমাদের শিল্প
আমাদের চোখের ভেতর থেকে হারিয়ে গেলো!
এক এক করে গাঁয়ের শিল্প যদি হারিয়ে যায়
নিঃশেষ হয়
নতুন অজন্তা ইলোরা গড়তে অনেক দেরী হয়ে যাবে যে!

আমার কলম কেন জানিনা প্রতিনিয়ত
এক অনাবিষ্কৃত মেঘের স্বপ্ন দেখে—
যে মেঘ সামচীর আকাশে নেই, চেরাপুঞ্জীতে নেই
যে মেঘ নতুন শিল্পে পৃথিবী সাজাবে।
মেঘের গভীর দেহ চুম্বনে পাহাড়ের হাসি
তটিনীর বেশে রিম্‌ঝিম্‌ হেঁটে যাবে
গাঁয়ের শিরায়
মালশিরা ধানে, জামরুলে;
কমলালেবুর বনে ভীষণ শৃঙ্খলা—
ভাগ ক'রে খাওয়া হৃদয়-শিল্পী তৈরী হবে।

আমার স্বপ্নের মেঘ যখন একটু একটু ক'রে জমছে
সেজাম্মেল নিয়ামৎ তৈরী হচ্ছে
তখনই ওদের চলে যাওয়া।
কেন যাবে?
আমার স্বপ্নের ঘরে কেন বারবার
নর্দমার চোর শিল্প চেটে খাবে।

শাখা নদী

বাঘ যখন জল খায়
নদীকে আমি ভয় পেতে দেখিনি !
কুয়াশার ঝিঁনুক খুলে জানোয়ারগুলো নেমে আসে কোলকাতার রাতে—
কয়েক হাজার মা আমার শুয়ে আছে ফুটপাতে !

এই যদি
শাঁখা হাতে মা আমার বিদ্যাধরীর শাখা নদী ।

আমার শিশু ন্যাংটা শিশু

আমার শিশু নাইবা এলো কোলে !
আগুন আমার পরশপাথর
তাই বেঁধেছি আঁচলে !

শীতের রাতে ন্যাংটা শিশু কাঁদে
কাঁদিসনারে বাছা আমার
কাঁদিসনারে রাতে
শীত তাড়ানো আঁচল দিয়ে জড়িয়ে নেব তোকে
চাঁদের ভাতি নাইবা দিলাম
ভাত দেবো তোর পাতে ?

আমার শিশু ন্যাংটা শিশু
আগুন দিলাম, নে !
আমার শিশু ন্যাংটা শিশু
পরশ দিলাম, নে !
শীতের গায়ে ছোট্ট পায়ে
আলতো লাথি দে !

রামধনু কবির দুচোখে

(হাসপাতালে অসুস্থ বীরেনদাকে দেখে)

একটি মানুষ হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে
আমাদের দিকে হাত বাড়াচ্ছে !
একদিন এই হাতে কতনা মঞ্জরী ছিল
কতনা সবুজ, কতনা অন্নদাতা পাখীদের,
মানুষের ।
কতনা ডাক-রোদ হাত ভরে পান করেছে
এখনো বোলের গন্ধ লেগে আছে
এখনো রোদের গন্ধ লেগে আছে !

একটি মানুষ হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে
আমাদের দেখে হাসলো ঃ
কবির ও কবিতার বিষণ্ণ রামধনু ঠোঁট থেকে তুলে নিয়ে পাখী উড়ে গেল !

আয় পাখী আয় আয়
সোনার কপালে সোনা টিপ দেব তোকে ;
পাখী আসে, ডালে বসে
রামধনু কবির দুচোখে !

আমের বোলের গন্ধ

আমের বোলের গন্ধ পেয়েছি, তাই
ফিরে আসা, ফিরে যাওয়া ;
এতো যাওয়া নয়, ফিরে আসা !
নরম ঘাসের পতাকা ছিঁড়ে ফেলে, ছুঁই নীলিমা নগ্নহাতে
তবু সে বোলের গন্ধ ফিরে আসে রোজ রাতে !
কি করে বোঝাই হৃদয়কে
কি করে বোধাই মেয়েটিকে
আমি যে ওড়ানো, শেকড় পোড়ানো   বাতাসে

পরমেশ

একমাস বাদে দেখা হোল আমাদের
আলিপুর ব্রিজের নীচে ;
নদী যেন নদী নয়, এ যেন নদীর রেখা !
পালিয়ে বেড়াচ্ছিস কেন ?
'কোথায় পালালাম ?'
আজতো হঠাৎ, কতবার খবর পাঠিয়েছি ।
কি করবি ভাবছিস ?
'কিছুই না।'
কেন ?
'বাবার শরীর খারাপ, মা বলছিলো কোর্সটা কমপ্লিট কর।'
মাকে দেখতে যাবিনা, হারাণের মা !
চলনা, সামনের বুধবার ।
'পরে দেখা যাবে।'
দেখা যাবে !
'তোর আর কি, মা নেই, বাবা নেই,
গোলগাল রবারের টায়ার, যেদিকে চালাবি সেদিকে চলবে !'

পরমেশ মনে পড়ে
দুয়ার খুলে দাঁড়িয়েছিলো আকাশ ;
তুই আর আমি বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে
ধান্যকাটা থেকে বলরামপুরে যাচ্ছি
পায়ের নীচে জল ।
পরমেশ মনে পড়ে
জলের নীচে বুড়ো আঙ্গুল ভাসিয়ে তুই আর আমি
পথ হাঁটছি সত্তরের দশকে ;
মেঘের দিকে চোখ উঠিয়ে বলেছিলি, সাবাশ মেঘ !
বলরামপুরে চাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে উঠোনে

জলে পা ধুয়ে তুই আর আমি দাওয়ায় উঠে
হারাণের মাকে বলেছিলাম—
মা, ছেলে তোমার বৃষ্টিতে
আর তুমি কিনা আগুন জেলে বসে আছো
মালসা দেখছি কোঁচড়ে !
কোঁচড়ের ভেতর থেকে মালসা মাটিতে নামিয়ে রেখে
বুড়ীমা হাসতে হাসতে কাঁপতে কাঁপতে দুয়ার খুলে দিলো !
এ তো শুধু দুয়ার খোলা নয়
ভালোবাসার দুয়ার খুলে দাঁড়িয়ে আছে সোনার ফালি চাঁদ !
মা আমাদের হাতে মালসা দেবেই দেবে
আর তুই বাধা দিচ্ছিস ;
হঠাৎ তোর মুখের আদল গেলো পাল্টে—
তাকিয়ে আছিস, তাকিয়ে আছিস
নদী যেমন তাকিয়ে দেখে মোহনা
ঝর্ণা যেমন মাটি !
মা আমাদের ছেঁড়া কাঁথায় জড়িয়ে রেখে
গুটি গুটি
বসলো গিয়ে পান সুপুরির পাশে ।
শব্দ যেন শব্দ নয়
হাজার মেঘে আছাড় খেয়ে বেরিয়ে এলো সুর,
পরমেশ এ তো তোরই গানের সুর—
'গণফৌজের পায়ের তালে কাঁপছে আকাশ
দুলছে ধানের ছড়া, বাজছে দামামা
দুয়ার খুলে দাঁড়িয়ে আছে সোনার প্রতিমা
আমার মা !'

এসপ্লানেড ইস্ট থেকে মিছিল সেরে ফিরছি
পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলি তুই—
পেছন থেকে খোঁচা মারতেই ঘুরে দাঁড়ালি ;
কোঁচকানো ভুরু !

'ও! পরিচয় করিয়ে দিই—
এ আমার স্ত্রী—'
নমস্কার।
'এ আমার বন্ধু প্রলয়েশ।'
'নামের মিল আছে দেখছি!'
কাজেরও ছিলো!
'মানে?'
কবে বিয়ে করলি?
'মাসখানেক।'
একদিন আসুন না আমাদের নতুন বাড়ীতে!
আজ তাড়া আছে। ছটায়,
আমার আবার প্রথম থেকে না দেখলে…'

পরমেশ, মেঘনাকে মনে পড়ে
নীলপাড়, মেঘের শরীর!
পাহাড়কে লাথি মেরে সাগরে মিশেছে!
মেঘনা একটি নদীর নাম।
আমাদের মেঘনাও তাই ছিলো।
পরমেশ মনে পড়ে
মাথার উপর শাল আর মহুয়ার পাতা
সারারাত সারারাত ঝিঁঝিঁ পোকা জোনাকিকে ডেকে বলে কথা
মচ মচ পাতার শব্দ
মচ মচ পাতার শব্দ
ট্রিগারে আঙ্গুল দিয়ে বসে আছি
উৎকণ্ঠী বাতাস দুলছে, বাতাস দুলছে
নীলপাড়, মেঘের শরীর, ধূসর গায়ের রঙ
খিলখিল হাসি
কাছে এসে দাঁড়ালো মেঘনা;
তোরই কাছে!
এতো রাতে কে খবর দিলো?

"বাতাস, বাতাসগো বাতাস, বাতাস বলে যায় কানে কানে
কোথায় মোহনা।'
এতো রাতে এসে ঠিক করনি মেঘনা!
মাটির পাত্রে কিছু ভাত রেখে চলে গেলো নদী—
রেখে গেলো উথাল পাথাল ঢেউ
অন্ধকারে জেগে থাকে ভালোবাসা নামে কোন পাখী—
সে তো তুই পরমেশ!

পরমেশ, বুড়ীমা এখনো বেঁচে
দুয়ার খুলে দাঁড়িয়ে আছে সোনার প্রতিমা!
মেঘনা এখনো আছে—
মেঘনা মিশেছে মেঘে
অথবা মেঘ মিশেছে মেঘনায়!

যা এখনো পারিনি

আমার রুটি আমি সংগ্রহ করেছি
রুটির জন্য আমাকে আর রাস্তায় দাঁড়াতে হয় না!
বরং আমি এখন দু-একজনকে রুটির পয়সা দিতে পারি
দামী সিগারেট!

আমার অনেক ছাত্ররা খেয়ে আসেনা
বাড়ীতে খাবার নেই!
আমি তাদের দু-একজনকে আট আনা একটাকা দুটাকা···

যা এখনো পারিনি
সাজিয়ে দিতে পারিনি
বুকের নিকেতনে আকাশ
চন্দ্রবিন্দু চাঁদ
তারায়, তারায়···

শতবার্ষিকীতে

পাথরের চোখ
পাথরের মুখ
পাথরের কান
অষ্টধাতুতে বুক
পাথরের মার্কস !

তোমাকে কালীঘাটের কালী
বিষ্ণুপুরের শিব
তার পাশে বসাবো

আরতি পাবে
সিংহাসনে আছি
আরতি পাবে

নদীতে নদী নেই
পাহাড়ে পাহাড়
মানুষে মানুষ থাকবে কেন ?

ভুখা মানুষকে যেন পাথর বানাতে পারি !

টাইগার হিলে সূর্য

টাইগার হিলে সূর্য ঃ
জরায়ুর ভেতরে যেন শিশুর শয্যা
আহা লজ্জা, অপরূপ লজ্জা !
গর্ভবতী জননীর মুখ চারিদিকে
রঙ চারিদিকে,
মুখ চারিদিকে

হরিজন মেয়ের অসুখ

খোঁপায় গোঁজার ফুলগুলানি বন-বাদাড়ে কাঁদে !

হরিজন মেয়ের অসুখ
বুনো গেঁদাল পাতা ছাড়া আর কি আছে তোর আঁচলে

মা আমার !

এক ফার্লং দুই ফার্লং তিন ফার্লং দূরে
উড়াল মেঘের নীচে লাল মুনিয়া নীল মুনিয়া
হরেক রকম ওষুধ
রুখা ঠোঁটে কেউ কি দিবি আকাশ দুইয়ে
এক ফোঁটা দুধ !

পরব আসবে, নাচতে হবে যে
আউলি বাউলি খ্যাপা চাঁদনী রাতে

খোঁপায় গোঁজা ফুলগুলানি বন-বাদাড়ে কাঁদে।

রাত দুপুরে শিশুর কান্না

রাত দুপুরে শিশুর কান্না ঃ
বাবা তুমি যেও না
ও বাবা তুমি যেও না !
দুষ্টুমিতো আমিও করি
ভাঙ্গি চাঁদের খেলনা
মাগো তুমি 'ভাঙ্গবোনা চাঁদ'
আমার মত বল না !
বাবা তুমি যেও না
ও বাবা তুমি যেও না !

একটু গুছিয়ে কাজ করনা ভাই

একটু গুছিয়ে কাজ করনা ভাই !
সূর্য কেমন ওঠার আগে গুছিয়ে নেয় আকাশ
আকাশ ভেঙ্গে নেমে আসে আকাশ জুড়ে রাজহাঁস !

রয়াল গাছে রয়াল ফলে
কত গাছের গাছগাছালি
শেকড় কেমন গুছিয়ে দু'হাত
আল্পনা দেয় মাটির নীচে
না হয় একটু দেখেই এলি !

একি পিপাসার জল

কি হবে গৈরিক ধুলো সারা গায়ে মেখে
আমারও তো ঘর আছে, বাড়ী আছে, রমণীর মুখ
দস্তা নয়, রূপো নয়, লোহার আকর নয়
এনামেল করা কিছু সুখ !

কি হবে ধুসর জলে সারা গা ভিজিয়ে
আমারও তো ঘট আছে, কলসী ভরা জল
সে জলে ঝিনুক নেই, মুক্তো নেই
জলের ভেতর নাচে নগ্নতর মল !

একি পিপাসার জল, না অন্য কিছু !

আঁধার ঘরের প্রদীপ

আমার আঁধার ঘরের প্রদীপ বাইরে নিয়ে দেখি
অপমানে নীল হয়েছে রাত !
তবু বাতাস ডাকে
আকাশ ডাকে
বজ্র ঘন ঘন
সমুদ্দুরের বোবা শঙ্খ ছড়িয়ে দিল হাত ।

আমার আঁধার ঘরের প্রদীপ বাইরে নিয়ে দেখি
অপমানে নীল হয়েছে রাত ।

আমিও আপনাদের হয়ে

রোগীর ওষুধের জন্য চাই সমাজতন্ত্র
চাকরীর জন্য সাম্যবাদ !

কথাটা খারাপ বলেন নি
যুক্তি আছে—
ফর্সা আকাশের মত যুক্তি !

আমিও আপনাদের হয়ে
লকআউট জুট মিলের মজুরদের বলে দেব—
'বাবুয়া, সমাজবাদ নাহি আনেসে মেশিনকা চাক্কা
নাহি ঘুমেগা !'
বাঁকুড়ার কিষাণকে বলে দেব—
'সমাজতন্ত্র আসেক নাই
ত ই মাটিতে কূপ খনন হবেক নাই ।'

নদীকে বলে দেব
কানে কানে
(ও বড় মুখরা)
সমাজতন্ত্র আসেনি—
সাগরে যাস না !

রোগীর ওষুধের জন্য চাই সমাজতন্ত্র
চাকরীর জন্য সাম্যবাদ !

তোকে আনবে কে

কে আনবে তোকে
তোকে আনবে কে ?
খুঁজে খুঁজে জলঙ্গীর জঙ্গলা খাড়ির মত একা হয়ে আছি
কাছাকাছি পাখী ছাড়া আর কেবা থাকে ;
পাখীরা তো গাছের মঞ্জরী !
তোকে আনবে কে ?

রেশমী ছলাকলা বড় ভীড় করে আছে
নদী শুকিয়ে কাঠ
নিজের মুখোশ বিসর্জন দেব বলে প্রস্তুত হয়ে আছি ।

মাগো তুই কৃষ্ণচূড়ার মাথায় টোপর পরিয়ে
পাঠিয়ে দে না আকাশে
ও যেন বৃষ্টি নিয়ে আসে ।

এবার আমরা এসেছি

পাথরের চোখে কুয়াশা নেই—
এ হাওয়ায় সব সরে গেছে ;
পাথরও দেখতে পায়—
আমার বাঙলাদেশে গাছে কোন রঙের ময়ুর নেই-
শকুনেরা ফুল তুলেছে !
শকুনেরা ঠোঁটে ফুল
অন্ধকারে সভা বসেছে !
তবু হাওয়া বয়, হাওয়া
উথালি পাথালি হাওয়া।
অন্ধকারে সব দেখা যায় !

এসো, আমরা গাছেদের কাছে দাঁড়াই
বাতাসকে চুমু খাই
এসো, আমরা বাতাসকে চুমু খাই
গাছেদের কাছে দাঁড়াই।

গাছ, তুই গর্ভিনী হ
এবার আমরা এসেছি।

আকাশ ঠিকানা

সূর্য দিয়েছে সেতার
নদীও দিয়েছে হার
কণ্ঠ ভিজিয়ে পরেছি কণ্ঠে আবার !

আকাশ দিয়েছে দুচোখে পাখীর ডানা
দিকভাসি আমি দিকভাসি
মানবোনা কিছু মানবোনা !

আসলে এ তো সত্য নয়
এ আমার বানভাসি কামনা !
ডাকাত সূর্য গটমট করে হেঁটে চলেছে শস্য পোড়াতে
নদীতে নদী নেই
জলের লাশ !
ছেঁড়া ফাটা একটুকরো কাপড়ের মত আকাশ
লজ্জাও ঢাকেনা !

তবুও
তবু কাঁধ বেয়ে দুটো হাত নীচুতে নামেনা
এ হাতের বাসা নেই
আকাশ ঠিকানা !

কোলকাতা

কলার ছোলার চেয়ে পিচ্ছিল এ শহর মন্থর সন্ন্যাসী !
বাসি রুটি, পোড়া রুটি, মদ মাংস পাশাপাশি
জটাধারী বেশ আছো !
ভালো আছো শনিপূজো, কালীবাড়ী, রেস-মাঠ
ভালো আছো দানিকেন, রানীরাত, বৃষ্টির দেবতা ;
হাইড্রেন ভরে গেলে, খুলে গেলে
দারাস সাপের সাথে উঁকিঝুঁকি মারো স্বর্ণসীতা :
কোলকাতা !

আমার স্বদেশ

আমি পর্যটক নই
তবু তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করে ;

অর্ধেক শরীর কবরের ভেতর রেখে আমি কারো কাছে কিছু চাইতে শিখিনি—
টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে, আধপেটা খেয়ে না খেয়ে
বন্ধুদের অকৃপণ আস্থা কোমরে জড়িয়ে
আমি গোদাবরীর মোহনায় হরিজন ঝুপড়ির পাশে গিয়ে দাঁড়াই
সূর্য কচুরীপানার নীল ফুল নিয়ে কোথায় হারিয়ে যায় !

আকাশ বিহীন রাতের আঁধারে নতুন অতিথি আমি,
আমার পাশ দিয়ে ভাঙা বাঁশীর মত মানুষ ঘরে ফিরে যায়,
ক্লান্ত শরীরের ভাঁজে ভাঁজে রাত গড়িয়ে পড়ে !
হিলকার্ট রোডে সেই সরকারী বিজ্ঞাপনের কথা মনে পড়ে যায়—
"ঝর্ণার জলে নোংরা ফেলনা" !
অথচ এই সারি সারি ঝুপড়ি আর মানুষের বুকের উপর দিয়ে অন্ধকার
হেঁটেই চলেছে !

নিষেধের কোন বিজ্ঞাপন নেই, প্রতিবাদ নেই !
আমি শর্বরী উদ্যানে গিয়েছিলাম
ফুলের রাজারা থাকেন, থাকেন ক্রিসেনথিমাম ;
পাপড়ি ছুঁতেই পাহারাদার ছুটে এসেছিল !
মানুষ, হে আমার দক্ষিণের হরিজন মানুষ,
এই তো আমি তোমাদের ঘরে
ভালোবাসা নামে কোন তটিনীর পাড়ে ঘর ;
এখন আর অতিথি নই
কোন পাহারাদার নেই
এখানে ভালোবাসা বিনিময় হয়,
সারারাত সারারাত ঘোরে ফেরে ভালোবাসা নামে কোন নীল জোনাকী ;

আমি সেই আলো নিয়ে ফিরে যাচ্ছি,
আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি আকাশ বিহীন রাত,
ভাঙা বাঁশী, ক্লান্ত শরীরের ভাঁজ থেকে রাত গড়িয়ে পড়া !
বিদায়, বন্ধু বিদায় !
পূবের মানুষ আমি
সূর্যের রথের চাকা চোখের মণিপদ্ম রোজ ছুঁয়ে যায়,
আমার চোখ লাল হয়ে ওঠে ;
সেই চোখে ভাঙা বাঁশী সারাচ্ছি,
ক্লান্ত শরীরের ভাঁজ থেকে রাতকে নামিয়ে এনে শিকারী হয়েছি,
দূরবীণ পাহাড়ের উপরে যে আকাশ
সেই বিশাল আকাশ মানুষের মাথার উপর ঝুলিয়ে দিয়েছি,
আর সূর্য কচুরীপানার ভেতর থেকে যে নীল ফুল নিয়ে উধাও হয়েছিল
আকাশকে সেই ফুলে সাজিয়ে রেখেছি ।

নীল আকাশের নীচে
বাঁশীর মত বাঁশী
আমার মানুষ
আমার স্বদেশ এখন ইন্দ্রধনু ।

এখন যা প্রয়োজন

নিকষ অন্ধকারে পা রাখতে কষ্ট হচ্ছে,
জোনাকীরা নদীর ওপারে !
গোলাপায়রার মত ধুসর আকাশের রঙ পেলেও
সচ্ছন্দে নিশ্বাস নিই ।
আকাশের জবারঙ পৃথিবী রাঙায়—
আমি জলের গেলাসে রক্ত ঢেলেছি,
গেলায় ছুঁড়ে মারছি আকাশে ।

চায়ের পেয়ালায় নিবিষ্ট আবেগ লেগে থাকে
আমি হাতড়ে হাতড়ে সবার ঠোঁটে পেয়ালা ছোঁয়াচ্ছি।
উতলে পড়া ভাতের ফ্যানের ভেতর
দক্ষিণ সমুদ্রের গান শুনছি।
এখন যা প্রয়োজন তাই করছি—
দুঃস্বপ্নের বাঁশী মুখে নিয়ে স্বপ্নের স্বর তুলছি।

জীবনে একবারই

এমনতো অনেকই আছে জীবনে একবারই দেখা হয়
আর হয় না
তেমনি তোমাকে!
বটেশ্বরীর মাঠ পার হচ্ছো
কুশীকলাপাতার মত বাতাসে দুলছে চুল
চোখমুখ বুনো সরস্বতী
শোল মাছেদের মত মসৃণ দেহ
কাকে যেন খুঁজে বেড়াচ্ছো!

পাঁজরে শ্রমের দাগ
কাঠের বোঝা নিয়ে বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো যুবক;
মাথা থেকে বোঝা নামিয়ে নিলে অনায়াসে
দুজনে বাবলার নীচে চুমু খেলে—
গায়ে বুঝি আঠা ছিলো, বাবলার আঠা!

তারপর কংশাবতী পুড়ে গেছে
পুড়েছে সবুজ, যা ছিলো, যা ছিলো জীবন!
আগুন কি করেছে তোমাদের দুজনকে জানিনা।

এমনতো অনেকই আছে জীবনে একবারই দেখা হয়
আর হয় না!

তুমি কেন নিরুদ্দিষ্ট ইস্পাতের পাত

আপ অ্যাণ্ড ডাউন আসছে যাচ্ছে, তোমরা কামরা থেকে একবারও নামোনি,
বলেছিলো হিন্দমোটরের ট্রাকড্রাইভার সহদেব সাউ।
কথাটা আলতো টপকে দিয়ে ষ্টিয়ারিং-এ হাত দিতেই গাড়ী ভ্যানিস!
এ প্রায় দশবছর হোল। সেদিন থেকেই কথাটা আমার বুকের ভাড়াটে;
কখনো কখনো হাঁটতে হাঁটতে ঠোঁটের পুবে পশ্চিমে ঘোরে ফেরে, চুমু খায়!
প্রসঙ্গটা ছিলো নেহাৎই আচমকা; খবরের কাগজের অফিসে
ট্রেড্ইউনিয়ন নেতা
জগৎবাবু এসেছিলেন কি একটা কাজে। আমরা কবিতা লিখি, গান গাই,
পাড়ায় রাজনীতি করি; আমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন জয়দেব ঘোড়ুই
দক্ষিণ কোলকাতার এল, সির সম্পাদক; জগৎবাবু বললেন, ভালোইতো,
আসুন না একদিন, একটা ফাংশন করা যাবে। গিয়েছিলাম;
সামিয়ানা খাটিয়ে ফাংশন হয়েছিলো রাতভর; অনুরাধা গেয়েছিলো গান,
সুনীলদা করেছিলেন আবৃত্তি, সুশান্ত বাগচী সংস্কৃতি বিষয়ক বক্তৃতা;
আমার অবস্থা ছিলো অনেকটা বোরোলিনের মত এ্যান্টিসেপ্টিক
যখন যার তালকেটে যায়, আমি বীজাণুমুক্ত করি—যজুঃ সর্বত্র গীয়তে* !
তবু ঘুমের ভেতরে আমি নাকি কবিতা বলি
ঘুম থেকে জেগে উঠে স্ত্রী আলো জেলে লিখে রাখে;
তারই কয়েক পংক্তি শোনাচ্ছি তোমাদের—
ট্রাকড্রাইভার সহদেব সাউ তুমি আমার রক্তের আঁতুড় ঘরে সঙীন বসিয়েছো।
সপ্তম আশ্চর্য পুস্তকে লেখা আছে; অষ্টম আশ্চর্য কে, জানিনা এখনো।
শরীরের সমস্ত রোমকূপ দিয়ে রক্ত ঝরছে আমার;
সেই রক্তে কোন প্রস্রবণ হলে, কোন নদী হলে, অন্ততঃ হরিজন মেয়ের
পাথুরে বুকের উপর একফালি ঝর্ণাও যদি জন্ম নিত,
অষ্টম আশ্চর্য না হলেও, বিস্ময়ের চিহ্ন হয়ে বেঁচে থাকতাম
পৃথুলা এ পৃথিবীর আঁচলের এক কোণে, তাও হলনা! শুধু রক্ত ঝরা,
সঙীনের খোঁচা, নিহত হলেও বুঝতাম। মাটির গভীরে চলে যাচ্ছি
দাঁড় বেয়ে বেয়ে; তাও নয়! তাই এই যন্ত্রণায় দাঁড়ি নেই, কমা নেই,
সেমিকোলন খইয়ের ছাতুর মত অদৃশ্য নিমেষে!

ট্রাকড্রাইভার সহদেব সাউ, তোমাকে খুঁজেছি আমি উত্তরের চা বাগানে,
দক্ষিণের হরিজন ঝুপড়িতে, দেশলাইয়ের কারখানায়
তোমাকে খুঁজেছি আমি পূবে মেঘালয়ে, মধ্যে লোহার খনিতে ;
তোমার সঙীন তুমি তুলে নাও, নাহলে আমূল বিদ্ধকর খোমেইনির মত—
আমি যেন বসন্তের দাঁত আর ঠোঁট চুরি করে
দোলনার পাশে টুনটুনি পাখীর মত উড়ে উড়ে শিশুকে হাসাতে পারি ।
আজ থেকে পাঁচ বছর পরে কোন শিশু আর হাসবে না
গান্ধীটুপির মত মত ফ্যাকাশে রক্তহীন এই পৃথিবীতে !
ধুতরো ফুলের বীজ খাইয়ে মা যাবে থিয়েটারে ।

ট্রকড্রাইভার সহদেব সাউ । আমরা না হয় কামরা থেকে নামিনি বা
নামতে পারিনি
তবু ঘুমের ভেতরে গোপনে কাজ নেই লোহারা, গরুর, ভণ্ডী, বেরালার
প্রতি চেকপোষ্টে ;
যদি বাস্তারের গভীর জঙ্গলে গাছ ভেঙ্গে পড়ে
তোমার ট্রাকের শব্দ ভেবে, কপিল ধারার** মত ছুটে যাই ঘুমের ভেতরে !

পৃথিবীর তিনভাগ জলের মত ষড়যন্ত্র পরিষ্কার, একভাগ মাটিকে
গুঁড়িয়ে দেবার—
আমরা নাহয় কামরা থেকে নামিনি বা নামতে পারিনি
তুমি কেন নিরুদ্দিষ্ট ইস্পাতের পাত, স্পার্টাকাস সহদেব সাউ, মাটির সন্তান !

* যজুর্বেদ সর্ব কাজে প্রয়োজনীয় ।

** মধ্যপ্রদেশে অমরকণ্টকের একটি জলপ্রপাত ।

কসবার উজ্জ্বলের জন্য কবিতা

শিশুর গলার পাশে বৃষ্টির মত অসংখ্য আঙ্গুল
রক্তাক্ত হাত
বহুরু বা জয়নগরের পুকুরের পাড়ে !

ডাকাতের বিলে নাকি ডাকাতেরা ঘুঙুর পরে
সে তো অনেক, অনেক কাল গত হয়ে গেছে
আজও তবে বহুরু বা জয়নগর ডাকাতের বিল হোল কেন !

বহুরুতে সবেদার চাষ হয়
জয়নগরে লিচু ফলে ভালো
এখন কি সব গাছ ঢেকে দেবে ডাকাতের ছায়া !
আমরা তো চলে যাবো, মরে যাবো
শিশুদের জন্য কত নীচে হাওয়া !

রবিঠাকুর তোমার পৌষ মেলা দেখে এলাম

রবিঠাকুর, তোমার বিশ্বভারতী কত ছোট
পৌষ মেলা কত ছোট
তবে গাছে গাছে কিছু শীত লেগে আছে

সুরেনঠাকুরের বাড়িতে বনভোজন খারাপ লাগেনি
আমার পাতে কোনো ফুলকপির টুকরো পড়েনি এই যা
সজলদা ভিড়ের বাইরে গিয়ে কিছু রোদ পোহানিয়া গাছের শরীর
এঁকে নিয়ে গেছে ;

সাধন নিজেকে উড়িয়েছে ভালই
খাওয়ার সময় গোত্ খেয়ে উড়ে আসা ছাড়া ওকে দেখাই যেত না ;
ছেলেটি ছবি আঁকে ভাল
তবু একটিও ছবি পেল না।
বুকের ভিতরে ওর রজনীগন্ধা কাঁপে ঃ
এখানে কাঁপে নি কখোনও

রবিঠাকুর তোমার সাজান বাগান পৌষ মেলা দেখে এলাম ঃ
কালুর দোকানে লুচি,
শেয়ালদার দশরথের কাপড়, নান্টুর জুতো
এরই মধ্যে শুধামাধবের মিষ্টি কিছু লুঠ হয়ে গেছে !
আকাশ উড়িয়েছে লাল নীল অনেক রুমাল
তবুও আকাশ কত ছোট !
গাঁয়ের লোক নেই
দু'একটি সাঁওতাল ছেলে
তাও বুঝি ভালোবাসা রেখে এসেছে মায়ের আঁচলে।

রবিঠাকুর তোমার পৌষ মেলায়
পবনদাসের গান, আব্বাসের একতারা
লুঠ করে নিচ্ছে কিছু ভিন দেশী টেপ।
মাটির পুতুল, পুঁথির মালা, পায়ের নূপুর
সেখানেও শহরের মেয়ে আরতি বসাক, অঞ্জলি শূর

আমাদের জন্য একটা ফুর্তির আখড়া
কলকাতা ছেড়ে এতদূরে কেন ?
এমন মেলা তো চৌরঙ্গীর পাথরের সরায় প্রত্যহ।

রূপালি প্যালেস্তাইন

পি. এল. ও. ক্যাম্পের ভাইয়েরা এখন মাটির নীচে
বোনেরা মাটির নীচে
মায়েরা মাটির নীচে
শিশুর দোলনা, টুকিটাকি খেলনা ছড়িয়ে আছে,
শবচক্র মহামেলা অরাতি প্রাঙ্গণ।
পাপিয়া পাখীর ঠোঁটে তুষার লেগেছে,
একটিও নদী নেই
তুষার লেগেছে
একটিও গাছ নেই
তুষার লেগেছে
আকাশের নীল রঙ মাটিতে নেমেছে!

ফাদওয়াতু কান[১] তোমার হাতে কলম না রাইফেল
মাহমুদ দারভিশ[২] তোমার হাতে কলম না রাইফেল
ফৌজি আল আসমার[৩] তোমার হাতে কলম না রাইফেল!

একটি কলমের পিছু পিছু দশহাজার পাখী
একটি কলমের পিছু পিছু দশহাজার আঁখি
একটি কলমের পিছু পিছু দশহাজার রাইফেল লাইন
একটি কলমের পিছু পিছু রূপালি প্যালেস্তাইন।

১. ফাদওয়াতু কান—প্যালেস্তাইন কমেণ্ডো ও মহিলা কবি
২. মাহমুদ দারভিশ—প্যালেস্তাইনের বিখ্যাত কবি
৩. ফৌজি আল আসমার—প্যালেস্তাইনের বিখ্যাত কবি

এমনকি তুমিও না

বিম্বিসারের দেশ দেখছি
পাহাড় শুধু পাহাড়
পাঁচপাহাড়ের চূড়ায় উঠে
মেঘের ছেলে, মেঘের মেয়ে
সবাই বাইছে দাঁড় !

টাঙায় চড়ে যাচ্ছি আমি
দেখছি বেনুবন
ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যা নামে
সন্ধ্যা নামে যখন
চাঁদ উঠেছে রাজগৃহে* ঃ
ছোট্টছেলে টাঙাওয়ালার হাসি ;
এমন চাঁদ কেউ দেখেনি
তুমিও না, পরজীবী বুদ্ধ উপবাসী !

সুবর্ণরেখা হোল না

আমাদের প্রত্যেকের একটি ঘর আছে ঃ
পর্ণকুটির, বস্তির দোচালা, সবুজ হলদে দালান ;
আমাদের প্রত্যেকের ঘরে নদী আছে

নদীর জলে কতনা খোঁজা—
আনন্দ, সুখ, বেশ্যা, বাঁচার কবিতা !

কি গভীর বিচ্ছিন্নতা নদীতে নদীতে !
একটি নদীও সুবর্ণরেখা হোল না !

---

* রাজগীরে

শব্দ

শব্দ করো
শব্দ যদি অহঙ্কারী নয়।
পাতার শব্দ নদীর শব্দ
শব্দ গন্ধময়।
পাখীর কাছে শিখতে পারো
নদীর কাছে শিখতে পারো
মেঘের কাছে আরো।

তড়িঘড়ি করে ঝর্ণার জলে নোংরা ফেলনা একবারও

মে দিবস, ১৯৮৩

আমি ফুলের কাছে গেছি
পাখীর কাছে
ফুল আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে
পাখীও তাই!
আমি নদীর কাছে গেছি
পাহাড়ের কাছে
নদী আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে
পাহাড়ও তাই!

ফুলের কাছে চেয়েছিলাম রঙ
পাখীর কাছে ডানা
নদীর কাছে চেয়েছিলাম হৃদয়
পাহাড়ের কাছে আকাশ।

রঙ নেই
নেই ডানা
হৃদয় নেই
নেই কোন আকাশ ;
আমি এখন কোথায় দাঁড়াবো !

স্পাইজ, ফিসার, এঙ্গেলস*
তোমরা ফুল হ'তে পারোনা ?
স্পাইজ, ফিসার, এঙ্গেলস
তোমরা পাখী, নদী, পাহাড় হতে পারোনা ?

গোলাপ পাতা সই

লাল আলতা   ফুলের মালা
গোলাপ পাতা   সই
ধূপের গন্ধ অন্ধ মেয়ে
কোথায় গেলি কই ?

সই পাতালাম   সীতার সাথে
গোলাপ পাতা আমার :
পাতা আমার হারিয়ে গেল
আগুন গিলছে খামার ।

* স্পাইজ, ফিসার, এঙ্গেলস—মে দিনের প্রথম সংগ্রামের তিন শ্রমিক নেতার নাম ।
এদের ফাঁসী হয়েছিলো ।

আগুন যার বুকে

আগুন যার বুকে
সেইতো সাত তাড়াতাড়ি আগুনের কাছে যায় !
নিমপাতার মত তিক্ত এ পৃথিবীতে কতদিন আর
আগুন পুষে রাখা যায়, রক্তে !

আসলে আমরা প্রস্তুত ছিলাম না, তাই··· ।

তিনি কিন্তু বলতেন, কাজগুলো তাড়াতাড়ি সেরে ফেলা দরকার ঃ
"আমার কবিতা, আলমারি ভর্ত্তি বই, নদী, মেঘ সবই কেমন
এলোমেলো,
এখানে সেখানে ছড়ানো ছেটানো, এমনকি প্রেম !
মাতলামো যেন ওদের পেয়ে বসেছে
এবার শাসন করা দরকার
সাজিয়ে ফেলা দরকার !
আর তো দুটো বছর···"

তখন ওনার বয়স ষাট পেরিয়েছে,
আমরা হেসেছি, বলেছি ঃ
আসলে আপনিই মাতলামো করছেন ।

উনি নির্মল হাসতেন ।
আমরা বুঝিনি,
তাই হাসতেন !

আগুন যার বুকে···

ঘরে ফিরবি না ?

ঘর বন্ধ করে চলে যাব
চাবিটি জানলার পাশে,
তুমি এসে খুলে নিও
আমি চলে যাব !

কবে যে কঠিন টিয়ার ঠোঁটের মত পাশাপাশি,
জানিনা !

কত আর জল দিয়ে কবিতা লিখবি
জলের পাঁজড়ে

ঘরে ফিরবি না ?

রাতের রাজা

এত রূপ কোথায় পেলিরে বৃক্ষ
এত সাজ কেন তোর ভূবনে !

আমাকে সাজিয়েছে রাত
রাতভর চুম্বনে !

এত রাত কোথায় পেলিরে বৃক্ষ

যামিনী অন্বেষা বাতাস আমাকে ঠিকানা দিয়েছিলো !

সে কোথায়, সে কোথায় ?

রাতের রাজা গ্যালিলিও চিমনি ফুঃ দিয়ে বাঁশী বাজায় !

আমাকে হাত ধরে

দোহাই লম্পটের নারী ডুবোনা পুকুরে
দোহাই উষ্ণবয়সিনী ডুবোনা সাগরে
দোহাই তুষার কন্যা কেরোসিনে ভিজিওনা শাড়ী
দোহাই বিধবা চাঁদ ফলিডলে লিখনা জীবনী !

তার চেয়ে নক্ষত্র বাধা পেলে মেঘের আঁচলে
তুমি কোন অন্ধকারে যে কোন দলের কাছে চলে যাও,
বলো, 'তোমাদেরই শেখানো চিহ্নে উজ্জ্বল ছাপ
দিয়ে যাব চিরদিন ;
বাড়ী থেকে পোলিং স্টেশন নয়,
ঐটুকু পথ অন্ধ পেঁচাও হেঁটে যেতে পারে !
হতে পারি অসহায়, সীমন্তিনী তবু,
আমাকে হাত ধরে নিয়ে চল, বাতাস যেখানে বলি হয়
ডাকাতের বিলে ;
তোমাদের শেষতম পোলিং স্টেশনে !'

জ্যোতির্ময় পাতায় তোমাকে ঢেকে দেবো

পূবের দেশ ভারতবর্ষেও মৃতদের আমরা
ফুলের তোড়া উপহার দিই ;
এটাই নিয়ম।
নীলগিরি থেকে দার্জিলিং
যত ফুল ফোটে, তার অর্ধেক দেবতার পায়ে,
বাকিটা বাড়ির শোভা আর মৃতদের জন্য।

বেঞ্জামিন, তোমার জন্য
আমি এই প্রথাসিদ্ধ ফুল ছুঁড়ে দেবো না ;
আমাদের দেশের সবচেয়ে দীর্ঘতম বৃক্ষের নাম দেবদারু
দেবদারু বীথিকায় ঘেরা আমাদের গ্রাম,
আমাদের শহর, তারই কিছু পাতা আমি সংগ্রহ করেছি ঃ
তোমার দেহে আমি কিছু পাতা ছড়িয়ে দেবো,
দেবদারু পাতা, যে আকাশে দোল খায়,
সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রের তিন আলোয় জ্যোতির্ময় ।

বেঞ্জামিন, আমি সেই জ্যোতির্ময় পাতায়
তোমাকে ঢেকে দেবো ।

ব্যক্তিগত ১

চারিদিকে পাথর
আশ্চর্য পাথর ঘুমিয়ে আছে !
তখন কেউ যদি বলে, দাদা,
আঘাত দিয়েছি বলে কিছু মনে কোরোনা,
ভুল হয়ে গেছে !

একটি পাথর অন্তত জেগে আছে ।

ব্যক্তিগত ২

চৌকাঠে তাঁর মাটির প্রদীপ
ঘরে বরণডালা !
প্রদীপ আছে, বরণও আছে,
নক্সী ফুলের খেলা
সে নেই শুধু সে !
হিমেল হাওয়ায়
মাটির সরায় বৃষ্টি রেখে গেছে

দুঃখ দে

সুখের কাছে হার মেনেছি
এবার দুঃখ আমায় দে ঃ
কলসী ভরা, ঘড়া ঘড়া
যত পারিস দে ;
যদি বলিস পাতাল ঝর্ণা
মাথায় যাব নে !

সুখের কাছে হার মেনেছি
এবার তুইই আমার সে,
যত পারিস নগ্ন, গভীর, নির্জনী রাত
মাথায় তুলে দে !

মাঠ, প্রান্তর, বন্দরে
একক শ্লোগান ঃ
ঘড়া ভর্ত্তি মোহর মোহর ঃ
দুঃখ দে, দুঃখ দে !

আকাশ আমার আকাশ

কত যে ফুল ফোটাতে পারো
নিমেষে আবার মুছে দিতে
কত কুমারীর চুল নিয়ে খেলা খেল
নিমেষে আবার ফিরিয়ে দিতে
আকাশ !

পাহাড় রাঙানো, এ তো চির অভ্যাস
ঘর বাড়ি সারা পৃথিবীতে
কোথাও রাখনি শয্যা !
ঝর্ণাকে তুমি আলুথালু দেখিয়াছ
দাওনি কখনো লজ্জা ;
খালি হাতে বাঁশী বাজানোর অবকাশ
তোমারই তো আছে
আকাশ আমার আকাশ !

ওফেলিয়া,

আকাশ দেখিনি আমি সারারাত
অথচ জেগেই ছিলাম
প্রিয় চোখ ছিল জানালার পাশে রাখা
হৃদয় বুঝি বা তুষারেই ছিল ঢাকা
মুজনাই তীরে, আঁকা-বাঁকা
ধীরে, উড়ে গেল দূরে
অভিমানী বলাকা !

আকাশ দেখিনি আমি সারারাত
অথচ জেগেই ছিলাম
প্রিয় চোখ ছিল জানালার পাশে রাখা
পৃথিবীতে বুঝি শিশির পড়েনি সেদিন
চোখের পাতায় জল দিয়ে রঙ
কিছুই হলো না আঁকা

আকাশ দেখিনি আমি সারারাত
অথচ জেগেই ছিলাম
প্রিয় চোখ ছিল জানালার পাশে রাখা
দেখিনি বাতাস-মূর্ছনা সাথে ছিল
আকাশের চেয়ে বড়
হৃদয়ের ইশারা !

সমগ্রে দেখেছি আমি

সারাক্ষণ বিষণ্ণ প্রতিমা তুমি
বিষাদ, বিষাদ !
সমগ্রে ছড়িয়ে হাত
দেখনি আকাশ !

বালি আর নুড়ি
ছোট বোধ নিয়ে ঘোরা।
কোনখানে সুন্দরের মুখ তবে
অনিন্দিত সুন্দরের মুখ ?
কোনখানে সুখ ?

সমগ্রে দেখেছি আমি ষাট কোটি আশ্চর্য ইলোরা।

বুদ্ধ বলে গেছে

আমাকে আঘাত করা সহজ :
নীরবতা বড় পরিচিত ধারাপাত বৃক্ষের মতো
তবু সে তো ফুল দেয়—নিসর্গের হাসি।
আমার জীবনে কোন নিসর্গের ইন্দ্র নেই :
কালো চাঁদ যাও ছিলো ডুবে গেছে বেহুলার চোখে
আঘাতে আঘাতে মোক্ষ বুদ্ধ বলে গেছে !

নদীয়ার সাতজন তরুণ শহীদের জন্য এলিজি

এ এক আশ্চর্য গৃহবন্দী আমি
শেকল খুলে দিলেও বেরুবো না ;
কিন্তু বেরুতেই হবে !

যৌবরাজ্যে চাঁদ
চাঁদিনীতে যৌবন
এই তো শুনেছি !
এখন সব গোলমাল হয়ে যায়
চাঁদনীতে যৌবন মরে
চাঁদ পাহারায় !

শহীদের সংখ্যা কত
মৃত যৌবনের সংখ্যা কত
এক দুই তিন
চার পাঁচ ছয়
সংখ্যাকে সংখ্যা করে জয় !
ঢেউয়ে ঢেউয়ে সংখ্যা ভেসে আসে
আরো আরো
সবুজ পাতারা আসে, সাদা ফুল ;
ওরা বলে, আমাদেরও মারো !
মৃত যৌবনের সাথে চলে যাবো
কতবার কাঁদাবে আমাদের
চোখে জল নেই
সীমান্তে পৌঁছে গেছি।
কবে যে কান্না শুরু মনে নেই, কবে !

এ এক আশ্চর্য গৃহবন্দী আমি
শেকল খুলে দিলেও বেরুবো না ;
কিন্তু বেরুতেই হবে !
কেন বেরুবো না

বাঘের মুখের ভেতর মরেছে জ্যোৎস্না

রাস্তায় দেখা হবে

আমার বাড়ী নেই
এসোনা ।
বাড়ীতে সুর থাকে, সুরে কিছু প্রেম লেগে থাকে
কিছুই পাবেনা
এসোনা ।
আসলে যাকে তোমরা বাড়ী বলো
সেণ্টেড চিতাবাঘ শুয়ে থাকে
ঘুম পাড়িয়ে রাখি ব'লে তোমরা টের পাওনা ।
পথে দেখা হ'লে আমার চোখ দেখো
তাহলেই বুঝবে আমার বাড়ী নেই ।

কিছু কিছু বন্ধু
ভাল হ্রদে থাকে
আমাকেও বলে !
যে বাড়ীর নীচে মাটি নেই
আমার না পসন্দ !
বাড়ীতে সুর থাকবে, সুরে কিছু প্রেম লেগে থাকবে
এরই জন্য জন্ম দিয়েছিলেন আমার মা
কিছুই হোলনা !

আমার বাড়ী নেই
এসোনা,
রাস্তায় দেখা হবে।

কতকাল

নদীতে ভাসিয়েছি ভেলা আমরা কজন
যে ঘাটেই যাই সহস্র চোখ একসাথে এক কথা বলে
দেশ কোথায়, বাড়ি
বাড়ি কোথায়, দেশ!

বাড়ি মালাবার
দেশ ভারতবর্ষ
বাড়ি গুজরাট
দেশ ভারতবর্ষ
বাড়ি বাঙলা
দেশ ভারতবর্ষ
বাড়ি আসাম
দেশ ভারতবর্ষ
ভেলা ভেসে যায়!

ঘুমোতে পারি না
ঘুমের ভেতরে সেই চোখ
দেশ কোথায়, বাড়ি
বাড়ি কোথায়, দেশ!

চারিদিকে মাদারের বন, মাদারের কাঁটা
বনে আর জঙ্গলে ঘিরে আছে নদী
ভারতবর্ষ, তুই কতকাল ভেলায় ভাসবি।

শব্দ খুঁজি

তোমরা আমাকে কবিতা লেখাও
আমি পাথর ভাঙ্গি
আঙ্গুলগুলি ছড়িয়ে দিই
শব্দ খুঁজি, শব্দ আনি !

এখন পাথরে যে কালবোশেখী
কি যে করি ?
পাহাড়, পাহাড়,
পাহাড়কে যে জড়িয়ে ধরি···
শেকড়ে তার তুষার
শুধুই তুষার !

সবাই যেন মাতাল কেমন !
কলম কাঁপছে
কলম ঘামছে
দারুণ ক্রোধে ।

কলম তুমি ভুল কোরো না ঃ
ভালোবাসার কলম তুমি ;
সহিষ্ণু হও, ধৈর্য ধরো
কালবোশেখীর শরীর ধরেই ঝলকে যাবো ।
ঐ তো দূরে একটু দূরে ঝর্ণা মেয়ে পাহাড় প্রিয়া
ঐখানেতে শব্দ পাবো ।

কী ভীষণ অন্ধকারে

(কার্লমার্কসের মৃত্যু শতবর্ষে)

কালো চাঁদ কালো পাখী কালো ফুল বৃক্ষের দোলনায়
শস্যকে হারিয়ে মাটি কালো হার পরেছে গলায়
নদীও কালো জল টেনে নিয়ে যায় !
কার্ল, কী ভীষণ অন্ধকারে তুমি ন্যাংটা হয়ে আছো !
এসো, আমার জামাটি পরিয়ে দিই গায় ।